KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : 34/2 Mohim Haldar St. Cal-26
Collection : KLMLGK	Publisher : Dhira Bhattacharya
Title : অনুরাগ (ANURAAG)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 13 15 17 22	Year of Publication : Jan 1998 Sep 1998 May 1999 Jan 2001
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : Dhira Bhattacharya	Remarks :

CD Rom No : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পঁচিশে বৈশাখ

অনুরাগ

সপ্তদশ সঙ্কলন, বৈশাখ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ সর্বাধ্যক্ষ ঃ শান্তি রায়
পৃষ্ঠপোষক ঃ দীপালী চৌধুরী, মীনা বসু, বিউটি মজুমদার, অপরেশ সেন।

অনুরাগ

সপ্তদশ সংকলন ঃ বৈশাখ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
মে ১৯৯৯

উপদেষ্টা প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য
সহযোগী। অর্চিতা রায় চৌধুরী, জয়ন্তী সান্যাল,
সাংগঠনিক প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

সপ্তদশ সংকলন, বৈশাখ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
মে ১৯৯৯, ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

রাগানুগ
অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিভঙ্গি ৩

প্রবন্ধ রম্যরচনা
পৃষ্ঠা ৫—২৪
বিশ্বনাথ ঘোষ, মনীষা বাগচি, অমরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী।

গল্প উপন্যাস
পৃষ্ঠা ২৫—৪২
কণা সেনগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, হরি ভট্ট।

কবিতা ছড়া
পৃষ্ঠা ৪৩—৫৫
মাধুরী সিংহ, দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখা দে, নীরেন্দ্র গুপ্ত, ধরিত্রী চক্রবর্তী, ওমর আলী, সুধা চট্টোপাধ্যায়, বন্দনা বসু (মিষ্টি) কামরুন নাহারহেনা, রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুচন্দ্রনাথ দাস, অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, কণিকা সোম, অর্চিতা রায়চৌধুরী, গোপালকৃষ্ণ গুহ, বাজীরাও সেন।

পুস্তক পরিচয়
পৃষ্ঠা ৫৫—৬২
প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার
পৃষ্ঠা ৬৩—৬৬

অনুরাগের নিবেদন—৬৭

সত্য প্রেস, ১০/২-এ প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।
দশ টাকা

অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিভঙ্গি

অর্থনৈতিক তো বটেই, বাস্তব রাজনৈতিক কৌশলেও বড় মাপের ভুল করেছে ভারত পোখরানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। আন্তর্জাতিক মহলে উপযুক্ত গুরুত্ব না পাওয়া, বিশেষত পরমাণু-শক্তিধর দেশগুলোর এক-চক্ষু মনোভাব, সব মিলিয়ে হতাশ হয়েই ভারত পোখরানে দ্বিতীয় দফায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু সেই হতাশার এহেন প্রকাশকে কোনো ভাবেই সমর্থন করা যায় না। বিশেষত এতদিন পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে অটল থেকে বিশ্বে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে এসেছে ভারত। তা থেকে এ ভাবে সরে আসাটা নৈতিক স্খলন বলেই মনে হয়।

আন্তর্জাতিক মহলে অবশ্য ভারতের আরো গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল। অথচ তা কখনো হয়নি। ভারতের মতো দেশ-গুলোর সমস্যা পরমাণু-শক্তিধর দেশগুলো কখনোই পাত্তা দেয় নি। বরং ভারতের আয়তনের সাত ভাগের এক ভাগ যে পাকিস্তান, তার সঙ্গেই এক-করে বারবার দেখা হয়েছে ভারতকে। এতেই ভারতের হতাশা ও বিরক্তি। কিন্তু তার জবাব কখনোই পরমাণু বিস্ফোরণ হতে পারে না।

যারা খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের আক্রমণ করেছে, সেই অসহিষ্ণুরা আপতত নিজেদের দিকে নজর ঘোরাতে পারলেও শেষ পর্যন্ত সুবিধে করতে পারবে না। কারণ, দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই মানুষ সরব হয়েছেন। দলে নিজেদের নীতি প্রতিষ্ঠা করতেই আক্রমণ-কারীরা এসব কাণ্ড করছে এবং আপাতত দলেরই একাংশকে যথেষ্ট বিব্রতও করতে পারছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যর্থতার জন্য সরকার অবশ্যই দায়ী, শিক্ষায় ভারতের এই ব্যর্থতার সমান দায় বিরোধী দলগুলোরও! কারণ, একের পর এক বিভিন্ন দলের সরকার এ নিয়ে কিছুই না করলেও বিরোধীপক্ষও এই বিষয় নিয়ে তেমন ভাবে সরব হয় নি। ...বিরোধীরা সরকারকে চেপে ধরে নি। কেন?...

গণতন্ত্রে দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি এখানেই গুরুত্বপূর্ণ। চীন বাজারকে যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, তা ভারতের পক্ষেও অনুকরণীয়। ...বাজার-অর্থনীতি নিয়ে বাড়াবাড়ি কখনো ঠিক নয় বরং মুক্ত অর্থনীতি বাজার দখলের একচেটিয়া প্রবণতাকে ঠেকিয়ে রেখে দক্ষতা বাড়ানোর কাজে সাহায্য করবে।

গণতন্ত্র হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার জন্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্যই পাঁচ রকমের স্বাধীনতা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মতোই দরকার প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার অধিকার। তা মানুষের দক্ষতা ও ক্ষমতা বাড়ায়। ...সরকার আর্থিক লেনদেন সহ যা যা করছে, তা জনগণের জানার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। ...শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রেই নয়, সরকারি নীতির ফলে বেকার হয়ে পড়া নাগরিককে রক্ষা করার দায়িত্বও সরকারেরই। ...তিনি বলেছেন ঃ

পুরস্কার লব্ধ অর্থ দিয়ে শান্তিনিকেতনে তাঁদের বাসভবনের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ট্রাস্টের নাম হবে 'প্রতীচী ট্রাস্ট'। মূল লক্ষ হবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা যা বহুদিন ধরেই তাঁকে ভাবাচ্ছে। প্রথম দিকে ভারত ও বাংলাদেশ হবে এই রাষ্ট্রের কর্মপরিধির অন্তর্গত।

চাই ২০০১ সাল বিশ্বনাথ ঘোষ

ইতিপূর্বে বহুদেশ ভারতে তীর্থদর্শন ও তীর্থভ্রমণ করে গেছে। এবার ভারত চলেছে গ্রীস, রোম নয় প্যারিস, বার্লিন নয়, চলেছে মস্কো। লক্ষ্য তার রাজনীতি। সময় ও সাহসের গুণে, বিপিন গাঙ্গুলী নয়, এস. এন. রায় অর্থাৎ নরেন ভট্টাচার্য চলেছেন। তিনি প্রচণ্ড বুদ্ধিমান, প্রচণ্ড বাহাদুর কিন্তু অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা হয়ে পড়েছেন। তাঁর ভাবনা, এই বুঝি তাঁর আসনখানি ঝড়ে উড়ে যায়। ১৯২৭ সালে পণ্ডিত মতিলাল জহরলালকে নিয়ে তিন দিনের জন্য মস্কো গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি হয়ে সেখানে যান। তখন সৌম্যেন্দ্রনাথ দেখেছেন, ভারতের স্বাধীনতা গান্ধীবাদ অর্জন করতে অক্ষম এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্কসবাদের মধ্যে পথ খুঁজছেন। কিন্তু গান্ধীজির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আজীবন ছিল। তিনি বলতেন গান্ধীজির মধ্যে সাহসের অভাব ছিলনা, তাঁর সাহসের রূপটা ছিল আলাদ। রবীন্দ্রনাথের আসরে নানা রঙের ও নানা রকমের মানুষ আসতেন এবং তাঁরা শূন্যহাতে কেউ ফিরতেন না। কবি এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সুধীন দত্ত তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর বিপরীত চরিত্রের বন্ধু, এম. এন. রায়কে রবীন্দ্র-দরবারে হাজির করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এমন এক সময় ১৯৩০ সালে হঠাৎ আক্রমণ করলেন বৃটিশ পার্লামেণ্টের এক মহিলা জেলবন্দী জহরলালকে এবং রবীন্দ্রনাথ বললেন, কে এই মিস র‍্যাথবোর্ন আমি জানিনা তবে জহরলালের প্রতি এই ব্যবহার অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এম. এন. রায় রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে ভারতকে ছোট করলেন।

প্রমথ বিশী ছেলেবেলা থেকে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পরে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। বললেন, সৌম্যর সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছি, শেষ ঝগড়া করেছি টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটুট নিয়ে সারারাত ওর এলগিন রোডের বাড়িতে বসে। কিন্তু সৌম্যর মৃত্যুর পর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

ইওরোপ রবীন্দ্রনাথকে বলেছিল, তাঁর মধ্যে আছে পুরুষের এক মাপা সৌন্দর্য। প্রমথ বিশী বলছেন, আমি জানি সৌম্য রবীন্দ্রনাথের থেকে এক ইঞ্চি লম্বা ছিল, ছয় ফুট এক ইঞ্চি। কিন্তু কখনো সাজ পোষাক করতো না। তার পুরুষোচিত রূপ ছিল যথেষ্ট। তার মত বাঙলায় বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা কারো মধ্যে দেখিনি। সে সংস্কৃত, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ, জার্মান ইতালিয় জানত। শেষে হিন্দীতেও বক্তৃতা করতেন। সৌম্যর রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওপর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট।

এবার, এ. কে. চন্দ, অপূর্ব চন্দ, অনিল চন্দদের কথা, কিছু বলি। এই তিন ভাই মনে করতেন, গুরুদেব শেষের কবিতার "অমিত রে" চরিত্রটি গড়েছেন এদের কাউকে দেখে। আর লাবণ্য? থাক, সেটা আর বলব না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তিন ডিক্‌টেটারকে ভাল মন্দ কিছু দিয়ে গেছেন। মোসলিনী রবীন্দ্রনাথকে ইতালিতে নিয়ে যাবার জন্য অনেক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। সেগুলি নিশ্চয় শান্তি-নিকেতনে এখন আছে। জার্মান বন্দি শিবির থেকে রোমা রল্যাঁ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে খবর দিয়েছিলেন বিশ্বকে। খবরটি হিটলার বিশ্বকে জানিয়েছিলেন। স্টালিন লুনাচারস্কীকে বলেছিলেন, আমি চুপ করে থাকলাম, আপনি টেগোরকে আমন্ত্রণ জানান। লুনাচারস্কী বললেন, সবাই আসুন, টেগোর যা বলবেন তাতেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। রাজা রামমোহন রায় গান্ধীজির মন্ত্রগুরু লিও টলস্টয় থেকে ছাপ্পান্ন বছরের বড় আর জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৩ বছর। গান্ধীজির মত প্রাজ্ঞ লোক তো রামমোহন

রায়কে চিনতে পারেন নি। একজন হাঙ্গেরীয় সাংবাদিক একটি বই লিখেছেন—'আমি হিটলারের জেলে বন্দি ছিলাম' মিউনিক জেল। অষ্টো জার্মান বর্ডারে হিটলারের পুলিশ, গাড়ি থেকে নামিয়ে প্রশ্ন করেছিল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে Are you the Tagore, who was born in Calcutta 1901? Follow me. অভিযোগ Plot to Assassinate হের হিটলার। তারপর ছাড়াপেয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়েছিলেন মস্কো। লুনাচারস্কীর আমন্ত্রণে। এই হিটলার, নেতজীকে একবার দেখেছিলেন এবং কিয়েল থেকে ডুবজাহাজে। তুলে দিয়েছিলেন জাপানী ডুব-জাহাজে, প্যাসিফিক ওসানে।

এই হচ্ছে ব্যাঙালীর পরিচয়। এখন তারা কোথায়? আবার দেখা পাব নিশ্চয়।

শান্তিনিকেতনের পাঠভবন ও সাহিত্যসভা

মনীষা বাগচি

বর্তমানে ইঁদুর দৌড়ে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা এবং ভবিষ্যৎ গড়ার তাগিদে, বাইরের আর কিছু জানতে বা শিখতে চায় না। তারজন্য হয়ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও দায়ী। পড়ার বইয়ের চাপে পড়ে তারা সাহিত্যচর্চার আগ্রহ বোধ করে না। যার ফলে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং জীবন গড়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই ফাঁক থেকে যাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। কারণ তাদের মধ্যে কল্পনাশক্তি গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না। যা খুবই বেদনাবায়ক। যার ফলে এই প্রজন্মের কাছে জীবনধারণ খুবই ক্লান্তিকর হতাশাপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে 'পাঠভবন' এমনই একটি শিক্ষাকেন্দ্র

যেখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে নাচ, গান, সাহিত্যচর্চার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে উঠুক।

সেদিক থেকে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি শৈশবেই শান্তিনিকেতনে চলে যাই, এবং আশ্রমিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠি। যার ফলে আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে আমি আমার আশ্রমিক পরিবেশকে গ্রহণ করেছি। যার স্মৃতি আমাকেও নিয়ত আনন্দ দেয়।

'পাঠভবন' হচ্ছে শিক্ষার প্রথম ধাপ। যেখানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় গাছ চেনানো, আশ্রম পরিচ্ছন্ন করা থেকে শুরু করে সাহিত্যচর্চা, দানসংগ্রহ, শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে। যার ফলে ছেলেমেয়েদের কাছে পড়াশুনাটা কণ্টকর হয়ে ওঠে না। সমগ্র-শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই যেন আনন্দের খোরাক মজুত থাকে।

'পাঠভবনের' ছাত্রছাত্রীদের তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়। যথা—শিশুবিভাগ, মধ্যবিভাগ ও আদ্যবিভাগ। ওখানে সপ্তাহের শেষ হয় মঙ্গলবার। বুধবার ছুটির দিন। তারপর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু। মঙ্গলবার ছিল সাহিত্যসভার দিন। এক এক মঙ্গল-বার একএকটি বিভাগে সাহিত্য সভা হয়। মঙ্গলবার বিকেলবেলা আশ্রমের যেকোন একটি স্থানে সাহিত্য সভার আসর বসত। প্রতি বিভাগের একজন করে সম্পাদক এবং সম্পাদিকা নির্বাচন করা হত। এদের কাজ ছিল নিজেদের বিভাগে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে স্বরচিত কবিতা, গল্প, রচনা প্রভৃতি সংগ্রহ করা।

সাহিত্য সভায় যাদের লেখা নির্বাচন করা হত, তারা নিজেদের লেখা সভার মধ্যে পড়ে শোনানোর সুযোগ পেত। এর ফলে সবার মধ্যে সাহস এবং শ্রোতাদের সাধুবাদের ফলে উৎসাহ বৃদ্ধি পেত। সভায় একজন সভাপতি থাকতেন যিনি সভা পরিচালনা করতেন।

তাঁর ভাষণে তিনি উৎসাহদান করতেন এবং স্বরচিত লেখা প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন।

সভাশেষে সমস্ত আশ্রমিক, ছাত্রছাত্রী শ্রোতাদর্শক সবাই শান্তি-নিকেতন গান গেয়ে সভা শেষ হত।

এই সাহিত্যসভা ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে আশ্রমিকের কাছে একটি বিরাট স্থান অধিকার করে থাকত।

আর অন্য কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের এমন সুন্দর সুষ্ঠু সুযোগ আছে বলে আমার জানা নেই।

কে এই আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা

অমরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মা শব্দটির মত এমন শ্রুতিমধুর মধুমাখা ও মমতাময়ী শব্দ আর নেই। রোগে শোকে দুঃখে বেদনায় সকলে মাকে স্মরণ করে, মাকেই ডাকে, মাকেই ডাকলে যেন সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়। এমন নির্ভর আর বিশ্বাস একমাত্র অমৃতময়ী 'মা' শব্দটির মধ্যেই রয়েছে। মা শব্দটির মধ্যেই যেন 'ম' স্বয়ং বিরাজ করছেন। তাই মায়ের মধ্যেই বিশ্ব আবার বিশ্ব মধ্যেই মা।

শরৎকালে মাকে আমরা দশভুজা দুর্গা রূপে দর্শন করি, আবার লক্ষ্মী, কালীরূপে,, জগদ্ধাত্রীরূপে আবার সরস্বতীরূপে দর্শন করি। বসন্তকালে আবার মাকে বাসন্তীদেবী রূপে, অন্ন-পূর্ণাদেবী রূপে দর্শন করি। এই মাটিকে আমরা মাতৃভূমি জন্মভূমি ও মা বলে প্রণাম করি, আবার এই মাটি নিয়েই মা আমার অপরূপা সেজে আমাদের দর্শন দেন। তখন কিন্তু আমাদের কাঠ, মাটি দিয়ে গড়া মূর্তির কথা মনে থাকে না।

স্নেহময়ী, মমতাময়ী, আনন্দময়ী, জগজ্জননীকে মাতৃরূপে আস্বাদন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। বিশেষত বাংলার নরনারী তখন আনন্দের হিল্লোলে উদ্বেলিত হতে থাকে। এমন কি বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেও তখন আনন্দের প্রবাহ চলতে থাকে। এ যেন এক অপূর্ব বাৎসল্য রসের লীলা।

অনন্ত রূপের মাঝে মা আমার বিরাজ করেন। তিনি সর্বকালে, সর্বদাই রয়েছেন, অথচ তাঁকে আমরা জানতে পারি না কেন, কে এই মা?

বৈদান্তিকগণ যাকে ব্রহ্ম বলেন, তান্ত্রিকগণ তাকেই ব্রহ্মময়ী বলেন। শ্রীরামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ব্রহ্মই কালী ও কালীই ব্রহ্ম। তান্ত্রিকগণ এই ব্রহ্মময়ীকে জগজ্জননী মহামায়ারূপে আরাধনা করেন।

বৈদিক যুগেও শক্তির আরাধনা প্রচলিত ছিল। দেবী সূক্ত ও রাত্রি সূক্ত তার স্পষ্ট প্রমাণ। বেদের এক মহান সাধিকা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মহাযোগিনী নারী, যিনি অম্ভৃন ঋষির কন্যা 'বাক' এই নামে চিরস্মরণীয়া হয়ে রয়েছেন তিনি ধ্যানযোগ অবলম্বনে আত্ম-চেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বিশুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যের ভূমিতে অবস্থান করে, অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সেই অনুভূতির যে বর্ণনা করেছিলেন, তাই ঋগ্বেদের দেবী সূক্ত বা বাক সূক্ত নামে বিখ্যাত হয়ে আছে (১০/১২৫)। তিনি মাহাবিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত প্রকার শক্তির অভিব্যক্তি চলছে, সর্বপ্রকার শক্তির পরিণাম রূপ কার্যকারণ শৃংখলার অধিষ্ঠাত্রী রূপে যে সব দেবতা এই মহাবিশ্ব প্রপঞ্চের সব ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করছেন সকলের মধ্যে তিনি স্বীয় অনন্ত শক্তির আধার আত্মারই প্রকাশ দেখছেন। তিনি দেখছেন ও ঘোষণা করেছেন যে, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, সোম তুষ্ঠা, পুষণ ও ভগ প্রভৃতি দেবতারূপে আমি মহাবিশ্বে সর্বত্র বিচরণ করি ও

বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করি। এই মহাবিশ্ব প্রপঞ্চে যে যেখানে যে কোন শক্তির প্রকাশ, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেই হোক বা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রেই হোক, সর্বত্র আমার শক্তির খেলাই চলছে। আমারই স্বতন্ত্রলীলাময়ী ইচ্ছাশক্তির বিলাসেই মহাবিশ্বে সর্বপ্রকার ব্যাপার সুচারু রূপে সম্পন্ন হচ্ছে। আমি মহাবিশ্বাতীত আবার মহাবিশ্বে সর্বত্র আমারই মহিমা প্রকটিত, আমিই মহাবিশ্বরূপা যা কি না আজ তত্ত্ব-পিপাসুদের দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডীরূপে নিত্য পাঠ্য হয়ে আছে। দেবী বাক্ আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাথে নিজেকে একাত্ম অনুভব করেছিলেন তিনি কে? তার সব কর্মই যেমন অভূতপূর্ব তেমনি বিস্ময়কর। তাই চণ্ডীতে কখন মহাকালী কখন মহালক্ষ্মী কখন মহাসরস্বতী রূপে তাঁর প্রকাশ। এই মহাশক্তির নিজেরই অনন্ত গুণ দ্বারা নিজেরই বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, বিচিত্র ঐশ্বর্য, বীর্য, বিচিত্র জ্ঞান, বল বিক্রম বিচিত্র লীলা বিলাস দ্বারা স্বপ্রত অশেষ বৈচিত্র সমাকীর্ণ মহাবিশ্বে প্রপঞ্চের মধ্যে আপনার তাত্ত্বিক স্বরূপ চিরকাল নিজেই রহস্যাবৃত করে রেখেছেন। এই মহাশক্তি অনন্ত রস বিলাসিনী নিয়ত সৃষ্টি পালন ও ধ্বংসকারিনী। ভগবতী মহামায়া তার এই বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশের মধ্যে অনন্ত ভাবের, অনন্ত রসের, অনন্ত ভাঙ্গা গড়ার খেলা নিত্যকাল খেলে চলেছেন, অথচ অন্তরে তিনি নিত্য সমাহিত।

এই মহামায়া আদ্যাশক্তিই আমাদের জগদ্ধাত্রী, জগদীশ্বরী, বিশ্বজননী আবার আমাদের একান্ত 'মা দুর্গা'। যিনি আমাদের সকল দুর্গতি নাশ করেন। তাই মহামায়াকে দেবগণ স্তব করার সময় বলেছিলেন ঃ

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
মাগো তুমি সর্ব প্রাণীতে মাতৃরূপে অবস্থিতা
তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার॥

বিকর্ণ শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

আপনারা বলতেই পারেন মহাভারতে তাবড় তাবড় সব চরিত্র থাকতে স্বল্প পরিচিত অখ্যাত এক চরিত্র বিকর্ণকে নিয়ে কেন পড়তে গেলুম। তার কারণ আছে—প্রথমতঃ বাল্য বয়সে স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা কোন বিশেষ উপলক্ষে কিছু ছোট ছোট নাটক অভনীত হ'ত। এইরূপ একটি নাটক যতদূর মনে পড়ে, 'কির্ণাজ্জুন' অভিনীত হয়েছিল—তাতে আমার একটি ছোট অংশ ছিল, এই বিকর্ণের। অক্ষক্রীড়ার সভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, কিছুকাল আগে শ্রীযুৎ হর্ষ দত্ত রচিত একটি উপন্যাস পড়লুম যার মুখ্য চরিত্র বিকর্ণ, যিনি গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম কিন্তু অনন্যতম। তাঁরই লেখা অবলম্বনে এই রচনা।

এই চরিত্রটির উপর আমার সুপ্ত অনুরাগ আবার জাগরিত হল। তাই কিছু কিছু ঘটনা (মহাভারতে বর্ণিত) যেখানে তাঁর প্রতিবাদী চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। বিকর্ণকে বলা হয়েছে মানুষের চিরন্তন বিবেকের প্রতিভূ। তিনি সারাজীবন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত তীব্র প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারেননি। কোন দিক থেকে কোন সাহায্যই তিনি পাননি। বিষম প্রতিকূল বাতাবরণে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে একাই সংগ্রাম করে গেছেন, দৈবেরও কোন সহায়তা পাননি, তাই তিনি আজ স্মরণীয়।

অস্থিরচিত্ত ও অস্বাভাবিক ভাবে ক্লান্ত ও বিমর্ষ ব্যবহারে, বিকর্ণ-জায়া দেবাঙ্গনা সন্দিগ্ধ ও চিন্তাকুল হয়ে পতি বিকর্ণকে

বার বার জিজ্ঞাসা করায় এর কারণ কি বিকর্ণ অবশেষে বলতে বাধ্য হলেন, তোমার আগ্রহ ও অনুনয় দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের অন্ধ পিতা সমস্ত শুভবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে কৌরব কুলের মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আমাদের সর্বাগ্রজ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করেছেন। তুমি বলছ দ্যূতক্রীড়ায় এত কি অন্যায় কিন্তু জান এর কারণ আমাদের মাতুল মায়াবী শকুনি ও জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের চক্রান্তের মর্যাদা দিতে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের জয় জয়কার ও পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য বৈভবে ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন মাতুলের পরামর্শে এই চক্রান্ত করেছেন। দ্যূতক্রীড়াপ্রিয় যুধিষ্ঠিরকে ক্রীড়ায় আহ্বান ও কূট-কৌশলে তাঁকে পরাজিত করে মাতুল শকুনি পাণ্ডবদের সব বৈভব হরণ করে দুর্যোধনকে প্রদান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রাজ্ঞ বিদুরের সুপরামর্শ নস্যাৎ করে দুর্যোধনের পিড়াপীড়িতে পিতা এই গর্হিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্মতি দিয়েছেন। নিদারুণ পরিতাপে চক্ষু মুদ্রিত করে বিকর্ণ বললেন, অসহ্য যন্ত্রণা।

যুধিষ্ঠির পাশাখেলার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ধূর্ত শকুনিকে বলেছিলেন যে অসৎ পথে ছলনার আশ্রয় নিয়ে আমায় পরাজিত করো না। কিন্তু শেষে সত্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠির শকুনির মায়াজালে আবদ্ধ হলেন। যতই দ্যূতক্রীড়ার উৎসবের সমারোহে হস্তিনাপুর মত্ত হতে লাগল, বিকর্ণ ততই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন। অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তাই তার কারণ জেনে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁর শারীরিক কুশলতা সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে বললেন, আপনি উৎসবের সময় এত নিরানন্দ কেন? বিকর্ণ বললেন, উৎসবই বটে —আনন্দোৎসব না মরণোৎসব।

গুণগ্রাহী অনুজ ভ্রাতা চিত্রসেন বিকর্ণকে দ্যূতক্রীড়া স্থলে যেতে নিষেধ করলেন কেন না পণ রাখার ফলে পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির এমন নিঃস্ব—এখন তাঁর আত্মপণ মাতুল শকুনির হাতে

তুলে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—এ অতি নিষ্ঠুর করুণ দৃশ্য—বিকর্ণের পক্ষে অসহনীয় হবে।

পরক্ষণে বিকর্ণ যখন সভাস্থলে উপস্থিত হলেন দেখলেন যুধিষ্ঠির একে একে তাঁর ভাইদের পণে হারিয়ে নিজেকেই পণ-রূপে উপস্থাপিত করলেন,—সভার অবস্থা তখন থমথমে। ইতি-পূর্বে দুর্যোধনের কুৎসিৎ ইঙ্গিত ও কর্ণের অশালীন ব্যঙ্গোক্তিতে সভার আবহাওয়া কলুষিত। যখন যুধিষ্ঠির আত্মপণ রাখলেন বিকর্ণ আবেগমণ্ডিত হয়ে পার্শ্বে উপস্থিত অনুজ ক্ষেমমূর্তিকে বললেন, আমাদের দুরাত্মা মাতুল ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার চেয়ে এই ধর্মধ্বজী লোকটি নিকৃষ্ট। ক্ষেমমূর্তি মুষ্টি প্রহারে এই আত্ম-প্রতারক যুধিষ্ঠিরকে শেষ করে দাও। অনুজ তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, এই বৃহৎ ক্রীড়াযজ্ঞে তোমার অস্তিত্ব কতখানি, এখানে ত বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত।

এর পরই সেই চরম মুহূর্ত এল যখন স্বয়ং পাঞ্চালিকাকেই পণ রাখলেন যুধিষ্ঠির। সেই নিদারুণ মুহূর্তে বিকর্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সভামধ্যে মহাত্মা বিদুরের শোকাহত অবস্থা দেখে তাঁকে উজ্জীবিত করে বললেন, প্রতিবাদ করুন। বিকর্ণ জানতেন এর পরিণতি তাঁর উপর নির্যাতন, কিন্তু তা ভ্রূক্ষেপ না করে বিদুরকে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থেকে প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। বিদুর তখন দৃপ্তকণ্ঠে দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন, দ্রৌপদী কখনও দাসী হতে পারেন না—কারণ কৃষ্ণাকে পণ রাখার পূর্বে পণে হেরে গিয়ে যুধিষ্ঠির পাঞ্চালির স্বামীত্বের অধিকার হারিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্যোধন দূত পাঠালেন দ্রৌপদীকে সভায় আনবার জন্য। দ্রৌপদী প্রশ্ন রাখলেন যে আগে তিনি জানতে চান যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে তিনি পাশা খেলার আগে নিজেকে না তাঁকে বিসর্জন দিয়েছেন।

সভায় আসার অসম্মতিতে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধন আজ্ঞা দিলেন দুঃশাসনকে, তুমি বলপূর্বক দ্রৌপদীকে সভায় হাজির কর। এ সময় বিকর্ণ বারবার দুঃশাসনকে অনুরোধ করলেন, তুমি যেও না। আমার কথা রাখ তুমি যেও না। বিকর্ণের পার্শ্ববর্তী অনুজ ব্যঙ্গভরে বললেন, তুমি বিজিত পাণ্ডবদের সঙ্গে গিয়ে বোস, সেখানেই সম্মানিত হবে। বিকর্ণ দ্বিরুক্তি করেন নি, তাঁর ব্যক্তিগত অবমাননার চেয়ে দ্রৌপদীর অসম্মানই বড় হয়েছিল।

তারপরই ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তন। ভীমের যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিষোদ্গার ও সম্পূর্ণ দোষারোপ। বিকর্ণের উন্মুক্ত সভায় ভীমকে সমর্থন। দুঃশাসনের রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে বলপূর্বক সভায় আনয়ন। দ্রৌপদীর সভাগৃহে অভিভাবকবৃন্দকে প্রশ্ন,—আপনারা সকলে বলুন আমি জিতা না অজিতা। সকলেই অধোমুখে, কোন উত্তর নাই। বিকর্ণ এই সময় করজোড়ে সকল সুধীবৃন্দকে ঘুরে ঘুরে অনুনয় জানালেন, আপনারা বলুন পাঞ্চালি জিতা না অজিতা। সকলেই স্তব্ধ।

বিকর্ণ দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে থাকেন, লোকে ব্যসনাসক্ত পুরুষের বাক্য বা কর্ম কোনটাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করে না। এক্ষেত্রে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আচরণ ব্যসনাসক্ত পুরুষের ন্যায়, তাঁর কথার কোন মূল্য নাই। দ্বিতীয়তঃ দ্রৌপদী কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরের সহধর্মিনী নন, পঞ্চপাণ্ডব তাঁর পতি, যুধিষ্ঠিরের একা তাঁকে—পণ রাখার কোন অধিকার নাই। তৃতীয়তঃ দ্রৌপদীকে পণ রাখার পূর্বেই তিনি পরাজিত। তিনি পাঞ্চালির স্বামীসত্বচ্যুত। এই সব বিবেচনা করলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধা বলা যায় না।

মুহূর্তে সভাস্থল কোলাহলপূর্ণ হয়ে গেল ও অধিকাংশই

বিকর্ণের প্রশংসা করতে লাগলেন। কর্ণ স্তব্ধ সভার নীরবতা ভঙ্গ করে বিকর্ণর বালকোচিত চপলতার জন্য তিরস্কার করলেন ও দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামীর শয্যাসঙ্গিনী বারাঙ্গনা বলে সম্বোধন করে বললেন, শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় যা কিছু জয় করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত। বিদুর তখন বিকর্ণকে শান্ত করেন ও বলেন, তাঁর যুক্তি এদের কাছে কুযুক্তি। তাই সব বৃথা হবে। নিশ্চেষ্ট ও বাক্যবিলাসী সভাকে হতচকিত করে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে উদ্যত হলে বিকর্ণ রুদ্রতেজে উচ্চ-স্বরে দুঃশাসনকে বললেন, আপনি যদি অগ্রজভার্যার দেহবাস খুলবার চেষ্টা করেন তাহলে আমি আপনার উপর বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

এই সময়—দুঃশাসনের ইঙ্গিতে চারজন রক্ষী বিকর্ণের সম্মুখে ব্যূহরচনা করে তাকে নিষ্ক্রীয় করে। সভায় নানারূপ গণ্ডগোলের ভিতর ঘোষণা করা হ'ল হস্তিনাপুরে নানারূপ বিপর্যয় শুরু হয়েছে—চারিদিকে আগুন লেগে গেছে। অগ্নি বিষয়ক ঘটনা প্রধান বলে—বিদুর ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিকর্ণকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। তিনি অগ্নিনির্বাপণে চলে গেলেন।

এরপর ধৃতরাষ্ট্রের বরদানে দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের মুক্তি।

কিন্তু কিছু কালের ব্যবধানে দুর্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করার মনস্থ করলেন, কারণ বৃদ্ধ পিতার দ্রৌপদীকে বরদান তাঁর পছন্দ হয় নি। তথাকথিত "সহজ" শত্রু পাণ্ডবদের বিনাশ করাই শ্রেয়, কূটনীতি অন্ততঃ তাই বলে, এই তাঁর মত। যথাপূর্ব বিকর্ণের তীব্র প্রতিবাদ ও বজ্রকঠিন বাদানুবাদ, তার ফলে তাঁকে প্রহরী বেষ্টিত অন্তরীন অবস্থায় থাকতে হয়। দ্বিতীয় দ্যূতক্রীড়ায়ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ও ফলে দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত বাস।

বনবাসের কাল অতিবাহিত হ'ল। পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন। যুদ্ধের চিন্তা ও প্রস্তুতি। যুদ্ধ এড়াবার জন্য

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য ও উভয়-পক্ষের মধ্যে সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টা,—তাও ব্যর্থ হল। যুদ্ধ অনিবার্য দেখে ক্ষত্রিয় ধর্মের তাগিদে বিকর্ণের কৌরবের পক্ষেই যুদ্ধে যোগদানের সংকল্প। সঙ্গে থাকবে তাঁর অধুনা সাবালক পুত্র বিবস্বান। তিনি যুদ্ধে মৃত্যু অবধারিত জেনেও স্থির প্রতিজ্ঞ। সাধারণ জনমতের প্রতিচ্ছবি শূলধরের (গ্রামের প্রধান) কথায়, দুর্যোধন দুঃশাসনের পাপের ফল তাঁকে ভুগতে হবে। দুঃখের কথা যুদ্ধে নিহত হলে মহাকাল তাকে ভুলে যাবে। দুর্যোধন, দুঃশাসন বাদে আর কোন গান্ধারী-তনয়কে মানুষ মনে রাখবে না।

তারপর মহারণ আরম্ভ হল। এরূপ সর্বব্যাপী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অপরিকল্পনীয়। উভয় পক্ষেরই বহু মহারথীর চরম পরিণতি। বিকর্ণের পুত্র বিবস্বান নিরুদ্দেশ। যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে কৌরবপক্ষের নিশ্চিত পরাজয় প্রতীয়মান হলে বিকর্ণ আবার শেষ চেষ্টা চালালেন যুদ্ধ বন্ধ করা ও দুই পক্ষের সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে। দুর্যোধনের কাছে সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হলে যুধিষ্ঠিরের কাছেও সেই প্রস্তাব করলেন। যদিও যুধিষ্ঠির তাঁর এই সদিচ্ছার ও সততার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন যুদ্ধের যা গতি ও প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে তাতে তিনিও সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাতে সাহস করলেন না।

সর্বশেষ চেষ্টাতেও বিকর্ণ কৃতকার্য হতে পারলেন না। তাঁর সমগ্র জীবন কি এক অখণ্ড ব্যর্থতার ইতিহাস? এই পৃথিবী যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে সকরুণ ভাবে। কেন তাঁর মনে পড়ছে দেবাঙ্গনার কথা? —পুত্র বিবস্বান সহসা নিরুদ্দেশ। বিষাদময় জগতে আজ তিনি একা। প্রিয়তমা দেবাঙ্গনা কি তাঁকে ক্ষমা করবে?—শেষ দেখাও করতে পারলাম না। যুদ্ধের শৃঙ্খলে আমি আবদ্ধ।

চতুর্দশ দিবসে মহারণ আরম্ভ হয়ে গেছে—বিকর্ণ মহাযুদ্ধে

লিপ্ত। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রিয়তমা দেবাঙ্গনা ও পুত্র বিবস্বানের ক্ষমাপ্রার্থী। বিবস্বান, আমার ক্ষুব্ধ বিবেক কোন উত্তরাধিকার রেখে গেল না। এই অকৃতী মানুষটির নাম যেন বিস্মরণের অতলে তলিয়ে যায়। কর্ণের মত তাঁর আক্ষেপও অযৌক্তিক হত না "রেখে গেছ মোরে ধরাতলে, নামহীন, দীপ্তি হীন পরাভব বলে"। ভীমসেন ধৃতরাষ্ট্রর শতপুত্র নিধনের প্রতিজ্ঞায় মত্ত। —সম্মুখে বিকর্ণকে দেখে ক্ষণিক স্তব্ধ হয়েও তিনি তাঁকে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হতে পারলেন না। পরে তাঁর মৃতদেহ দেখে শোকাহত হয়ে বলতে লাগলেন, তুমি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হলেও তোমাকে বধ করতে হ'ল শপথ রক্ষার্থে। আমি শত্রুবধে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলুম। জানি তুমি যাদের শত্রু বলে মনে কর না—তাদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ধর্ম রক্ষার্থে তোমাকে শস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। এটা তোমার জীবনে মর্মান্তিক প্রহসন। তাই আজ তোমার এই বীরোচিত মৃত্যুতে আমার চোখে জল! হায় বিকর্ণ, বিকর্ণ॥

লাল ফিতে সুব্রত চক্রবর্তী

১৯৭৩-এর ১২ সেপ্টেম্বর অফিসের কাজে কোচবিহার থেকে কলকাতায় গিয়েছিলাম। রাইটার্সে দেখা হয়েছিল রোড্‌স ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারি এস. পি. চ্যাটার্জির সঙ্গে। তখনই জানিয়েছিলাম যে ১৬ তারিখে প্লেনে কোচবিহার ফিরে যাব, এ কয় দিন কলকাতায় থাকছি।

অফিসের কাজকর্মের পর কিছু কেনাকাটি সেরে কালীঘাটের বাড়িতে ফিরতে সেদিন রাত আটটা বাজল। আসার পরেই মার কাছে জানলাম, সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময় আমার খোঁজে ডেপুটি

সেক্রেটারি এসে বলে গেছেন কী এক জরুরী দরকারে কাল সকাল সাড়ে দশটায় রাইটার্সে গিয়ে দেখা করতে।

বাড়ির কাছে ভবানী ভবন। ১৩ তারিখ সকালে ওখানে গিয়ে রাইটার্সে ফোন করে টের পেলাম, আমার জন্যে রোড্‌সের সেক্রেটারি মহল গরু-খোঁজা শুরু করেছে। গত কালই চ্যাটার্জিকে জানিয়েছিলাম কয়েক দিন কলকাতায় রয়েছি, তবু তালকানা হয়ে জরুরী টেলিফোনে আমার খোঁজ করেছে কোচবিহারে। ওনাকে আশ্বাস্ত করে জানালাম, চিন্তা করবেন না, একটু পরেই রাইটার্সে যাচ্ছি।

গাড়ি যোগাড় করে চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করলাম বেলা দু'টোয়। দেখা হতেই উনি জানালেন, গতকাল ১২ তারিখে অডিট রিপোর্ট নিয়ে সেক্রেটারি বিনায়ক মিশ্রকে অ্যাসেম্বলিতে খুব অপদস্থ করেছে। মোট তিনটি ডিভিশনের কাজ কর্মের সমালোচনা আছে ওই রিপোর্টে, কোচবিহার, নদীয়া ও হুগলী ডিভিশনের। কোচবিহারের ভাগে পড়েছে দু'টো রাস্তার কাজে বেনিয়মের জন্যে বদনাম।

বিনায়ক মিশ্র বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ নিজের ঘরে ছিলেন না। বেলা চারটের সময় ওনার ফেরার খবর টের পেয়ে এস. পি. চ্যাটার্জি আমাকে ওখানে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

মিশ্র সাহেব আমার পরিচয় শুনে জানতে চাইলেন, ওই কাজ দুটোর বেনিয়মের কারণ কিছু জানেন নাকি?

জানালাম, আমি তো সবে পনের মাস কোচবিহার ডিভিশনে এসেছি আর অডিটের আপত্তি দেখছি সাত বছরের পুরানো। না দেখে কিছু বলি কী করে?

বিনায়ক মিশ্র জানালেন, তবে আমিও তো বলতে পারতাম যে আমি ডিপার্টমেণ্টে সেক্রেটারি হয়ে এসেছি সবে চার মাস। এ সব বলে তো পার পাওয়া যাবে না? বরং ফাইলের কাগজ-পত্র

সব পড়ে সামনের মঙ্গলবার ১৮ তারিখে নিয়ে এসে দেখান, কার হুকুমে ওই সব কাজ শুরু করা হয়েছিল, আর ও' সবের এস্টিমেট এতদিনেও মঞ্জুর না হবার পথে অন্তরায় কী কী ছিল ?

সবিনয়ে বিনায়ক মিশ্রকে জানালাম সামনের রোববার ১৬ তারিখে প্লেনে কোচবিহার যাচ্ছি। ওখান থেকে কলকাতায় ফেরার পরবর্তী ফ্লাইট বুধবার ১৯ তারিখে। এর আগে ওখানকার ফাইল-পত্র পড়ে সঠিক উত্তর তৈরি করে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

অগত্যা, মিশ্র সাহেবকে বুধবারের দিন মেনে নিতে হল।

কোচবিহার ঘুরে ওই দিন দমদম বন্দরে আমাকে নিয়ে যেতে চ্যাটার্জি জিপ গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। সোজা হাজির হলাম রাইটার্স সেক্রেটারির কামরায়।

ফাইল পত্র ঘেঁটে উদ্ধার করেছিলাম, অডিটের চোখে আপত্তিকর কাজ দুটির মধ্যে একটির সম্বন্ধে আপত্তি টেঁকে না ; কাজের আগেই সেটার বিধিমত মঞ্জুরি করানো ছিল। অপর কাজটির সম্বন্ধে দেখেছিলাম যে আমাদের কোচবিহার ডিভিশনের তরফে করার কিছু নেই।

মানসাই নদীর ধার দিয়ে রাস্তা গিয়েছে ফালাকাটা থেকে শিলডাঙ্গা। রাস্তাটির গুরুত্ব আছে। বর্ষার সময় শিলতোর্ষা, চরতোর্ষা বন্ধ থাকলে এর ওপর কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি যেতে হবেই।

১৯৬৫ সালের মে মাসে দেখা গেল ওই রাস্তার সাড়ে সাত মাইলে রুইডাঙ্গার কাছে মানসাই নদী দ্রুত পাড় ভেঙ্গে এগিয়ে আসছে। পনের দিনের মধ্যে দু'শ ফুট ভেঙ্গেছে। নদীর থেকে ওই জায়গায় রাস্তার দূরত্ব দাঁড়িয়েছে চারশ' ফুট। রোডসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শরণাপন্ন হলেন সেচ বিভাগের স্থানীয় এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। শেষোক্ত জন জুন মাসে

একটা ৩১,১৫৬ টাকার এস্টিমেট করলেন ওই অঞ্চলে মানসাই নদীর হাত থেকে রাস্তাটি বাঁচাতে। কিন্তু তখনই তো কাজে হাত দেওয়া চলে না। ওই এস্টিমেটটি ওনার সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার-এর মাধ্যমে টেকনিক্যাল কমিটিতে সম্মতির জন্যে পাঠাতে হবে। তারপর চূড়ান্ত অনুমোদন আসবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছ থেকে। কিন্তু নদীর বয়ে গেছে নিয়মমত উপায়ে অনুমোদনের জন্যে বসে থাকতে। সে তার কাজ করেই চলল। জুন মাসের ২৫ তারিখে নদী ছিল রাস্তা থেকে ৩২০ ফুট দূরে, আর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এই দূরত্ব কমে দাঁড়ালো ২০০ ফুটে। এই দেখে কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনার, রোডসের এক্সি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে নদীর ভাঙ্গন থেকে রাস্তা বাঁচাবার সত্বর ব্যবস্থা নিতে রেডিওগ্রাম করলেন।

সেচ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এই সময় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত দিলেন যে এই ভাঙ্গনের কারণ হল, মানসাই-এর উপনদী মুজনাই দিয়ে জল আসার কমতি। কিন্তু মুজনাই-এর জল বাড়াবার কোনও পথ তিনি বাতলাতে পারলেন না।

অক্টোবরের ২২ তারিখে নদীর ভাঙ্গন চলে এল রাস্তার ১০০ ফুটের মধ্যে। এই দেখে রোডসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বুঝলেন, আর কারও ভরসায় থাকলে চলবে না, নিজের ব্যবস্থা নিজেই নিতে হবে। সেচ বিভাগের স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে জরুরী পরামর্শ করে একটা ৬,০০০ টাকার এস্টিমেট তৈরি করে ওই রাস্তার মেরামতির ঠিকাদারকে কাজে নামিয়ে দিলেন। কিন্তু তখন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। মাত্র তিন দিন পরে ২৫ অক্টো-বর নদী চলে এল মাত্র ৫০ ফুট দূরে। সঙ্গে সঙ্গে জরুরী টেলিগ্রাম করে এই সংবাদ জানিয়ে দিলেন কলকাতার ওনার

সুপারিণ্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে; তিনিও এটা জানালেন ওনার চীফ ইঞ্জিনিয়াকে।

রোডসের চীফ ইঞ্জিনিয়ার এর ফলে অন্য সব কাজ ফেলে সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে করে সরজমিন দেখতে এলেন ৩০ অক্টোবর। ওনারা দেখেই বুঝলেন, নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। বরং মানে মানে রাস্তাটাকে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ! এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে নির্দেশ দিলেন, ভাঙ্গনের জায়গা থেকে ৯০০ ফুট দূর দিয়ে সরিয়ে ৩,৬০০ ফুট দীর্ঘ একটা ডাইভার্সানের কাজে হাত দিতে, এবং ভারত-প্রতিরক্ষা-বিধি অনুসারে বিনা বাধায় এর জন্য প্রয়োজনীয় জমির দখল নিতে।

রোডসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ৩ নভেম্বরের মধ্যে ১,৩৩,২০০ টাকার এস্টিমেট তৈরির পর যথারীতি টেণ্ডার ডেকে ওনার সুপারিণ্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের অনুমোদন নিয়ে ২০ দিনের মধ্যে ঠিকাদর ঠিক করে কাজে হাত দিলেন। পরের বছর বর্ষার আগেই এই ডাইভার্সানের পথটি চালু হয়ে গেল এবং ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হল। কিন্তু এই কাজের জন্যে প্রশাসনিক সম্মতি মিলল না।

এই জরুরী কাজের এস্টিমেট সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বরাবর রোডসের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে এসে পেঁছিল ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু কোন সম্মতি না পাওয়ায় এক্সি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৬৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৮টি রিমাইণ্ডার দিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের মনো-যোগ আকর্ষণ করলেন। শেষে নিরুপায় হয়ে ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে ওনাকে একটা ব্যক্তিগত ডি. ও চিঠি দিলেন। এতে কিছু ফল হল। ১৯৭০ সালের এপ্রিলে চীফ ইঞ্জিনিয়ার

জানতে চাইলেন, এ কাজে তখন পর্যন্ত কত খরচ হয়েছে, আর কাজটি শেষ করতে আরও কত খরচ পড়বে।

১৯৭০-এর মে মাসে কোচবিহারের একসিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর উত্তরে জানিয়ে দিলেন, ৩১ মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৯৬,৯২৯ টাকা এবং দখলি জমির দাম বাবাদ ভবিষ্যতে আরও ১০,০০০ টাকার মত খরচ হতে পারে। পরবর্তীকালে ১৯৭০-এর জুলাই মাসে তিনি কাজটির এস্টিমেট মঞ্জুর করার জন্যে চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে লিখেছিনে। কিন্তু আজও তিন বছর পরে ওই কাজের কোনও মঞ্জুরি মেলে নি।

আমার দেওয়া ওই রিপোর্ট পড়ে বিনায়ক মিশ্র বললেন, এ বেনিয়মের জন্যে আপনাদের তো আর দায়ী করা যায় না দেখছি। এস. পি. চ্যাটার্জিকে শুধু বললেন, তাহলে ওই কাজের ফাইল খুঁজে দেখুন, আরও কি ব্যাপারে এটা আটকে ছিল।

ডেপুটি সেক্রেটারি এস. পি. চ্যাটার্জির সঙ্গে তার কামরায় গিয়ে এই ব্যাপারে বিভাগীয় ফাইল দেখার সুযোগ হয়েছিল। আট বছরের পুরানো বিবরণ ফাইলটি তাক থেকে ধুলো ঝেড়ে উদ্ধার করা হল।

ফাইলের প্রথম কয়েক পাতায় থাকে নোট-শিট। এতে লেখা থাকে ভেতরের চিঠিপত্রের সারাংশ এবং বিভিন্ন কর্তা-ব্যক্তিদের নানান অভিমত। দেখা গেল, ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে এই কাজটির জন্যে ১,৩৩, ২০০ টাকার প্রশাসনিক মঞ্জুরির সুপারিশ করে চীফ ইঞ্জিনিয়ার ফাইলটি পাঠিয়েছিলেন অর্থ-দপ্তরে।

এর ওপরে অর্থ-দপ্তর মন্তব্য করেন যে ডাইভার্সান রাস্তাটির প্রয়োজন হয়েছিল সেচ বিভাগের গাফিলতির জন্যে। ওনারা যথা সময়ে মানসাই নদীর কুলক্ষয় প্রতিহত করলে এই সমস্যার উদ্ভব হত না। অতএব এই কাজের প্রশাসনিক মঞ্জুরি বরং দেবে সেচ বিভাগ।

অর্থ দপ্তরের উপরোক্ত মন্তব্যসহ ফাইলটি ফেরত পাবার পর ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি চীফ ইঞ্জিনিয়ার লিখে দিলেন, যদিও এই ডাইভার্সানের রাস্তাটি রোডস ডিপার্টমেণ্ট থেকে করা হয়েছে, তবু এটা করার পর এই রাস্তাটি ব্যবহারকারী সরকারের সকল ডিপার্টমেণ্টই উপকৃত হয়েছে। অতএব এই কাজের জন্যে সেচ বিভাগকে দোষারোপ না করে এটার প্রশাসনিক মঞ্জুরি রোডস ডিপার্টমেণ্ট থেকে দিলে ক্ষতি নেই।

চীফ ইঞ্জিনিয়ারের উপরোক্ত মন্তব্য সহ ফাইলটি পাবার পর অর্থ দপ্তর ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে লিখে জানালো, আমরা অত শত বুঝি না, বরং বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্যে ফাইলটি ক্যাবিনেট সাব কমিটিতে পাঠানো হোক।

এর পর ফাইলটি চাপা পড়ে থাকে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত গত ছ'বছরে পশ্চিবঙ্গের মন্ত্রিসভার বেশ কয়েক বার ওলট-পালট হয়েছে। অনেক বড় বড় ব্যাপার নিয়ে ওনারা মাথা ঘামিয়েছেন। এই সামান্য দেড় লাখ টাকার প্রশাসনিক মঞ্জুরির জন্যে ওনাদের বসার সময় কোথায়?

মনে কিছু খটকা লাগলো। এস. পি. চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু অতগুলো যে রিমাইণ্ডার ও শেষের দিকে যে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হল, সে গুলো কোথায় গেল?

উত্তরে চ্যাটার্জি আর একটা পাতলা ফাইল দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না। ওদের জন্যে পরবর্তী কালে আর একটা পার্টফাইল ওপেন করা হয়েছে দেখছি। আগের পুরানো ফাইল আর কষ্ট করে উদ্ধার না করে শেষের দিকে এই পার্ট-ফাইল দিয়েই কাজ চালানো হত।

ফোন কণা সেনগুপ্ত

বিকেল চারটেয় ক্রিং ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠলো।

—সুমিত্রাদেবী বাড়ী আছেন?

—আপনি কে বলছেন?

—আমি উইণ্ড কম্যাণ্ডারের স্ত্রী বলছি।

—কি ব্যাপার বলুন তো?

না—সুমিত্রা দেবীর সল্টলেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যাওয়ার কথা ছিলো—গেছেন?

সুমিত্রাদেবীর মা বলেন—আজকে তো ওখানে যাওয়ার কোন কথা শুনিনি।

—তবে কোথায় গেছেন?

—ওরা মা মেয়ে—মেনকাতে সিনেমা দেখতে গেছে।

—উইণ্ডকম্যাণ্ডারও কি গেছেন সঙ্গে?

সুমিত্রাদেবীর মা—অবাক হয়ে যান—বিরক্ত হয়ে বলেন—উনি কেন যাবেন?

—আচ্ছা ঠিক আছে—বলে ফোনটা ছেড়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরেই আবার ফোনটা বেজে ওঠে। সুমিত্রাদেবীর মা ধরলেন। সেই মহিলা।

শুনুন—আপনাকে একটা কথা বলছি—আমার স্বামীর স্বভাব-চরিত্র ভাল না—সুমিত্রাদেবীকে বলে দেবেন। আমার স্বামীর সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা—না করেন।

ভীষণ রেগে সুমিত্রাদেবীর মা বলেন—দ্যাখ মেয়ে, সুমিত্রার বাইশ বৎসরের মেয়ে ও আঠারো বৎসরের ছেলে আছে। স্বামী একজন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তোমার কি সন্দেহ

বাতিক রোগ আছে? এটা কিন্তু মারাত্মক ব্যাধি—সংসার নষ্ট করে দেয়।

—হ্যাঁ—আমার সংসার অনেক মেয়ে নষ্ট করেছে।

—কে-কি করেছে জানি না। তবে সুমিত্রার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবে না—এ আশ্বাস আমি তোমাকে দিতে পারি। ওর এটা প্রফেশনাল লাইন—কাজ করবে—শেষ হলে চলে আসবে—এতে তোমার স্বামীর চরিত্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তোমার স্বামী যত বার কাজের জন্য আমার এখানে এসেছেন—অতিভদ্র-সম্মানিত-ডিসেন্ট ভদ্রলোক বলে মনে করি।

না—'ও' আপনার বাড়ীতে গেলে ওকে ঢুকতে দেবেন না—অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন।

সেকি? কেন আমি শুধু শুধু এ রকম একটা অন্যায় করবো? এতে তোমার কি ভাল হবে? তোমার স্বামী যখন বাড়ীতে গিয়ে তোমার উপর রাগারাগী করবেন—তখন তুমি কি করবে?

সে—আমি বুঝবো। মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ক'দিন ধরে—শুধু বলেন—নিজেকে সংযত করো। সুন্দর ভাবে সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর করো। নিজে বাঁচো স্বামী সন্তানদেরও বাঁচতে দাও।

আমি ট্রিপ্‌ল-এম-এ, বি-এড। ভাল গান করি।

শুনে সুমিত্রা দেবীর মা বলতে বাধ্য হন—সেকি? তুমি এত উচ্চশিক্ষিত-গুণী মেয়ে হয়ে—এই নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি? ছিঃ ছিঃ! —তোমাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কি সম্পর্ক এটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার—আমি জানতেও চাই না—শুনতেও চাই না। বলে ফোন ছেড়ে দেন। কি বিচিত্র চরিত্রের বাবা। ভাল ছেলেগুলির কপালেই দেখি—এ রকম সব বৌ জোটে।

ব্যবহার

মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচণ্ড চীৎকারে বাড়ী মাথায় করে ছেলেকে ডাকল অখিলেশ, 'বাবু এদিকে এস!'

o o o

'কি হল? এস বলছি!'

o o o

আমি গেলে কিন্তু ভয়ানক মার খাবে!'

এল বাবু।

অখিলেশ বলল ঃ 'কাছে এস'।'

এল বাবু কাছে।

স্কুলে পড়ছ। শুধু বই মুখস্থ করলেই চলবে? সভ্যতা, ভব্যতা—এসব শিখবে কবে? আমি কতদিন বলেছি, মাসীমা বলে ডাকবে। নাম ধরে ডাকবেনা।' অঞ্জলি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়।'

'ও তো আমাদের কাজের লোক—ওকে'

'এক চড়ে মুখ ঘুরিয়ে দেব—'

অখিলেশ চড় মারতে যাচ্ছিল ছেলেকে, অঞ্জলি এসে বাধা দিল ঃ 'ছেড়ে দিন। ছেলেমানুষ। ও কি বোঝে!'

বুঝতে হবে। কি ছাই লেখাপড়া শিখছে। কেমন বলছে, কাজের লোক!

অখিলেশ কড়াগলায় হুকুম দিল ঃ এবার থেকে মাসীমা বলবে। বলবে, মাসীমা, খেতে দিন।'

অঞ্জলি হাসল। বলল, 'না-না, আপনি বলতে হবে না। মাসীমাকে তুমি বললেই বেশি মিষ্টি শোনাবে।'

অঞ্জলি আদর করল বাবুকে ঃ তুমি ঘরে গিয়ে বস। আমি চা, খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

'যাও।' অখিলেশের পুনরায় হুসিয়ারী ঃ আর কোনদিন যেন নাম ধরে ডাকতে না শুনি।'

বাবলু চলে গেল—

অঞ্জলি কতকটা আপন মনে বলল ঃ ও ছেলেমানুষ। মা-মরা ছেলে। ভিতরে-ভিতরে দুঃখ চেপে রেখেছে। ওকে বেশি করে না বলাই ভাল।'

একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলে অখিলেশ তাকাল অঞ্জলির দিকে ঃ 'মা মারা যাওয়ায় একটা আঘাত পেয়েছে—সে তো আমি জানি। সেইজন্যই তো তোমাকে আমি সর্বক্ষণের জন্য রেখেছি—যাতে মনের ফাঁকা-ফাঁকা ভাবটা ওকে না কষ্ট দেয়। তুমিও যতটা পারছ, ওর জন্য করছ।

হঠাৎ অঞ্জলির কাছে এল অখিলেশ ঃ 'না-না, কা'কে 'কি' বলে ডাকতে হবে, কা'কে কতটা সম্মান দিতে হবে—এ বুদ্ধি তো ওর হওয়া উচিত। কেমন বলে, কাজের লোক! কাজের লোক বলে কি তার কোন মান-সম্মান থাকবে না? সে মাইনে নেয় বলে কি তার কোন আত্ম-মর্যাদা থাকবে না? এটা কিরকম কথা?'

'ওর এমন কি বয়স হয়েছে বলুন?' অঞ্জলি বলল, 'বড় হলে নিজের থেকেই শিখবে।

'ওটা কোন কথা না। শেখার বয়স ওর যথেষ্ট হয়েছে। কে কাজের লোক সেটা বোঝে—আর এটা বোঝেনা?—এই তো—' অখিলেশের গলা সহসা নরম মোলায়ম ঃ 'আচ্ছা অঞ্জলি, আমি তো তোমাকে রেখেছি। আমি, তোমাকে মাইনে দিই। কি, তাই না?'

মৃদু কণ্ঠ অঞ্জলির ঃ 'হ্যা।'

'তাই বলে, তুমি আমার বাড়ীতে কাজের লোক, আমার মাইনে খাও—এই সব ভেবে এমন-কিছু ব্যবহার করি কি, যা তোমার আত্মমর্যাদায় ঘা দিতে পারে? তুমিই বলনা, আমার কাছ থেকে কিরকম ব্যবহার পাও? কখন-ও কি চড়া গলায় কথা বলি? কখন-ও কি এমন ভাব দেখাই যে আমি তোমার মনিব?'

'না। আপনি আমার মনিব—এমন ভাব দেখান না।' অঞ্জলি বলে উঠল ঃ 'আর, সেই জন্যই—' অঞ্জলি ভিতরে গেলো তাড়াতাড়ি—

ফিরল ওর ছোট সুটকেসটা নিয়ে—

অখিলেশ থ মেরে দাঁড়িয়েছিল। চমকে উঠল ঃ 'কি ব্যাপার, হঠাৎ সুটকেস নিয়ে কেথায় যাচ্ছ?'

'বাড়ী।'

'কেন?'

'আপনার ব্যবহার মনিবের মতন নয় বলে।'

তিনটি মৃত্যু ও একটি জীবন-কথা

শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য

কদিন ধরে দুটি দার্শনিক মতবাদ নিয়ে ভাবছিলাম—Law of Average এবং Theory of Compensation। চেনাশোনা বহু মানুষের জীবন, জীবনের নানা পর্যায়ে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা আলোচনা করে যাচাই করে নিচ্ছিলাম ঐ দুটি মতবাদ প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা। হঠাৎ মনে পড়লো মালতীদির কথা।

বৌভাতের দিনে মালতীদির সলজ্জ হাসিভরা মুখটি মনে এল কতযুগ পরে। বাপ-মায়ের অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মধ্যে

মালতী ছিল সবার বড়ো, বাবা তাই বেশ কিছু খরচ করে কালো মেয়েটির জন্যে সুপাত্র পেয়েছিলেন। বিলিতি অফিসের কর্মী, মাইনেও পায় ভালো, তার উপর পাত্রটি বাড়ীর ছোটছেলে, সবার বড়ো আদুরে। কাজেই মালতীকে সকলেই ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়েছিল। রং কালো হলেও মালতীর মুখটি ভারী মিষ্টি, মানুষের সোহাগ আদায় করে নেবার ক্ষমতা ছিল তার সমগ্র সত্ত্বায়। আমার বয়স তখন অল্প, স্কুলে নীচু ক্লাসে পড়ি, কে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল "বৌ কেমন দেখলি?" ভোজ ভাল হয়েছিল, কাজেই মনটিও ছিল প্রফুল্ল, যে বৌটির সুবাদে এই প্রাপ্তি তাকে মুখের উপর খারাপ বলা যায়না, সকলেই ভালো বলে। তখন অবশ্য ভালোমন্দ বুঝতাম না, বলেছিলাম বেশ মিষ্টি হাসে। মিষ্টি হাসিভরা নববধূর সলজ্জ সেই মুখটি আজো আঁকা আছে মনে।

এর দুবছর পরে হঠাৎ কানে এসেছিল মালতীদের বড় বিপদ। মালতীদির স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধি, কোলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেছে। মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে কাশির সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছে। সেদিন টি. বি. ছিল দুরারোগ্য, রাজরোগ। উৎসবের দিনে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, বিপদে পাশে দাঁড়াবার মতো বয়েস তখন হয়নি, কেউ যেতেও বলেনি। ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ, মুমূর্ষু সন্তানের রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখের উপর অপলক চোখ রেখে তার মাথাটি কোলে নিয়ে বসেছিলেন মমতাময়ী বিধবা মা। দু একজন আত্মীয়া ওষুধপথ্য খুব সন্তর্পণে ছোঁয়া-ছুয়ি বাঁচিয়ে দিয়ে আসতো রোগীর ঘরে। মালতীদি তখন বাপের বাড়ী, সন্তানসম্ভবা। এ সব শুনেছিলাম অনেক পরে। আরো শুনেছিলাম, মালতীদির বাবা নানা কটু মন্তব্য করেছিলেন—রোগ চেপে পয়সার লোভে ছেলে বেচে মেয়ে কেনার অভিযোগ তুলে। মৃত স্বামীকে শেষবার দেখার জন্য মালতীদিকে নিজে এনেছিলেন।

আবার মেয়েকে চিরকালের মতো নিজের কাছে রাখার কথা শুনিয়ে জামাইবাড়ী ছেড়েছিলেন মেয়েকে নিয়ে। যন্ত্রণাবিদ্ধ মালতীদির মুখটি দেখিনি, বড় হয়ে সব ঘটনা শুনে কল্পনা করেছিলাম—কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রূপ-রস-গন্ধভরা মালতী হঠাৎ বজ্রপাতের তীব্রজ্বালায় বিবর্ণ এক ঝরা ফুল—কেউ কাছে টানবে না। মালতীদির মুখটি আমিও ভুলে গিয়েছিলাম কোন যোগাযোগ ছিল না বলে।

বছর আট-দশ বাদে। কোলকাতায় কলেজে পড়ি। থাকি এক আত্মীয়ের বাসায়। পাশে এক দুরসম্পর্কীয় দিদি থাকতেন। ও বাড়ী থেকে ভাগ্নে-ভাগ্নীরা প্রায়ই আসতো। একদিন ওদের সাথেই একটি সাত-আট বছরের মিষ্টি মেয়ে এল, একমাথা কোঁকড়ানো কালো চুল, ডাগর কালো দুটি মায়াভরা চোখ, একমুখ ফুলের মতো হাসি, চটুল নৃত্যছন্দে হাঁটাচলা, ভারী মিষ্টি সুরে পাকা পাকা কথা বলা মেয়েটিকে প্রথম দর্শনেই বড় ভালো বেসে ফেললাম। ছোট্টমেয়ে রিণি কখন যে 'মামা' ডাকে আমার মন জয় করে নিল টের পেলাম না। সুন্দর গল্প বলে, গল্প শুনতেও ভালোবাসে। কথা বলার সুবাদে জানলাম রিণি মালতীদির মেয়ে। সেই মুহূর্তে ও যেন আরো গভীর ভাবে হৃদয়ের কাছে চলে এল: শুনলাম মাকে ছেড়ে এই প্রথম আত্মীয় বাড়ী এসেছে, মা কোথাও যান না, কোনো উৎসব বাড়ী যেতে আগ্রহবোধ করেন না। ওদের গ্রামের মহিলা শিক্ষণ শিবিরে হাতের কাজ শিখেছেন। সুচের কাজ করে পয়সা তেমন না এলেও, সময়টা তো কোনোমতে কাটে। অতীতের দুঃস্বপ্ন যতো ভুলে থাকা যায়।

আরো দুবছর কোলকাতায় ছিলাম, রিণিকে আরো দুতিনবার দেখেছিলাম। তারপর চাকরিতে ঢুকলাম। গৃহিণী এল ঘরে, মালতীদি-রিণির কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। আমাদের প্রথম

সন্তান আগমনের বার্তা আত্মীয়বাড়ী পেঁাছে দেবার সময় আবার রিণিকে দেখলাম। তন্বী কিশোরী সারা সত্ত্বায় যেন মন কাড়া আনন্দের বার্তা। কাঁসার সুন্দর ছোট রেকাবিতে কিছু সন্দেশ ওর হাতে দিয়ে বললাম—মাকে দিও, আমাদের পরম আনন্দের দিনে তোমাদের মতো প্রিয়জনের কাছে সামান্য কিছু দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।

বছর তিনেক পরে আমাদের এক বন্ধুর বিয়ে হোল মালতীদিদের গ্রামে। কোলকাতা থেকে খুব দূরে নয়, বরযাত্রী গিয়ে ফিরে আসা যায়, কিন্তু কেনো জানি হঠাৎ ভেবেছিলাম এই সুযোগে শৈশবে দেখা মালতীদিকে একবার দেখে আসতেই হবে। মালতীদিকে খবর পাঠালাম, রাতটি ওদের বাড়ী কাটিয়ে পরদিন ভোরে কোলকাতা ফিরবো! শুনলাম উনি খুশী হয়েছেন।

বিয়েবাড়ী থেকে গভীররাতে মালতীদিদের বাড়ী যে গিয়েছিলাম, সবাই তখন ঘুমের মাঝে, শুধু মালতীদি আর তার বৃদ্ধ বাবা জেগেছিলেন। ওরবাবাকেঅনেকবার দেখেছিলাম, কলকাতার এক কলেজে সুপার ছিলেন, উনিই আমাকে ঘর দেখিয়ে দিলেন, হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় মালতীদির মুখটি ভালো করে দেখতে পেলাম না, দ্রুত মশারি খাটিয়ে চলে গেলেন। কোলকাতা ফিরবো বলে পরদিন ভোরে উঠে পড়লাম, দেখলাম সেই দুজনই উঠেছেন কিছু আগে। ভোরের আলোয় মালতীদিকে সর্বপ্রথম গভীরভাবে স্পষ্ট করে দেখলাম, ম্লান সেরে ফুল তুলছেন, ঠাকুর পুজো করবেন। পরণে পরিষ্কার সাদা থান ও ব্লাউজ, একমাথা অবিন্যস্ত কালোচুল, সুডৌল মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না কিছুরই নেই সামান্য প্রকাশ। মনের অতল গভীরে সমস্ত জাগতিক অনুভূতিগুলি সযতনে প্রচণ্ড চেষ্টায় লুকিয়ে রেখেছেন। আনন্দপ্রবাহে স্নান করার কোনো প্রবৃত্তি নেই চিরসাথীর অভাবে, দুঃখ-জ্বালা

প্রকাশের ইচ্ছা নেই, অন্যের অহেতুক করুণার উদ্রেক ঘটাতে। তবুও পাষাণ প্রতিমা বলে মনে হোল না, যেন কিসের প্রত্যাশায় দিন গুণছেন। আমাকে দেখে সাধারণ দুটো একটা কথার পরই বহুকষ্টে জানালেন তার সেই আশার কথা, শীঘ্রই রিণির বিয়ে, পাশের গ্রামের এক কলেজের প্রফেসর যুবক, রিণিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। মালতীদি অনুরোধ করলেন রিণির বিয়েতে যেন সপরিবারে উপস্থিত হই। কিছু পরে ঘুমজড়ানো চোখে রিণি এসে দাঁড়ালো। আরো বাড়ন্ত আর সুন্দর হয়ে উঠেছে, দেহের রং হয়তো কালো, তবু সমগ্র সত্ত্বা ঘিরে যেন অপূর্ব রঙ্গীন ব্যঞ্জনা, সুন্দর সুগন্ধি ফুলের রূপ-রস-গন্ধভরা অন্তর সৌন্দর্য ওর সারা মুখে যেন প্রতিভাত। বিয়ের কথা শুনে সলজ্জ মুখে প্রণাম করেই পালিয়ে গেল। দিদিকে বলে এলাম আমরা আসবোই।

দুর্ভাগ্যক্রমে কথা রাখতে পারিনি। কিছুদিনের মধ্যেই নর্থবেঙ্গলে বদলি হয়ে একা চলে যেতে হোল। বছর তিনেক পরে ফিরেছিলাম, কবছর কারো খবর তেমন রাখতে পারিনি। বাড়ীতে অবশ্য রিণির বিয়ের কোনো আমন্ত্রণপত্র আসেনি শুনেছিলাম। একদিন ট্রেনে রিণির এক মেসোমশাই অমৃতের সঙ্গে হঠাৎ দেখা, অমৃত স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল, ওকেই জিজ্ঞাসা করলাম রিণির বিয়ে কেমন হোল। আমার প্রশ্ন শুনে অমৃত অবাক হোল, জানালো যে বিয়ে তো হয়নি। বিয়ের মাসখানেক আগে রিণির শরীরে এক অদ্ভুত যন্ত্রণার সূচনা হোল, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তো। বিখ্যাত চিকিৎসক যামিনী সেনগুপ্ত চিকিৎসা করলেন। তখন পেনিসিলিন গ্রুপের সর্বরোগহর মহৌষধ বাজারে এসেছে, কিন্তু রিণিকে কোনো ইনজেকশন দেওয়া সম্ভব হোলনা, দিলেই অদ্ভুত বিক্রিয়া দেখা দিত। ডাক্তার জানালেন যে যেদিন রোগীনি স্বাভাবিকভাবে এই ইনজেকশন

গ্রহণের প্রবণতা ফিরে পাবে, সেদিন রোগ সারসে। নচেৎ কিছু করার নেই। বজ্রাহত মালতীদি ছুটে গেলেন প্রখ্যাত হোমিও-প্যাথ ডাঃ প্রবুদ্ধ মজুমদারের কাছে, উনি চিকিৎসা করছেন কবছর, একটু ভালো আছে।

মালতীদির জীবনে একটু সুখের দিন আসছে জেনে কবছর আগে সুখী হয়েছিলাম, আজ আবার মন দুঃখে ভরে উঠলো। ঠিক করলাম পুজোর পরই ওদের দেখে আসবো। পুজোর কদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, এর মাঝে অষ্টমীর দিন কানে এলো, রিণি কদিন আগে রক্তবমি করেছে, ডাঃ মজুমদার এর কারণ বা প্রতিবিধান ব্যাপারে কিছুই বলতে পারছেন না, এ রোগ নাকি লাখেও এক নয়। ওকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে মালতীদি এই প্রথম এক আত্মীয়ের বাড়ী উঠেছেন, বলছেন মেয়েকে না নিয়ে বাড়ী ফিরবেন না। কিছুই খাচ্ছেন না, শুধু অবিরাম কেঁদেই চলেছেন।

একাদশী না দ্বাদশী সঠিকভাবে মনে নেই, মালতীদির জীবনে আবার নেমে এল দ্বিতীয়বার দুঃসহ বজ্রাঘাত। অচৈতন্য থেকে হাসপাতালের বেডেই রিণির স্বল্পায়ু সুন্দর স্বপ্নভরা জীবনের শেষ হোল। মালতীদির কণ্ঠে দীর্ঘকাল পরে ফুটেছিল এক মর্মভেদী করুণ হাহাকার, পরক্ষণেই অজ্ঞান হয়ে জরাজীর্ণ মালতী ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিলো।

ঠিক কতোদিন পরে তার জ্ঞান ফিরেছিল, কথা বলেছিলেন কিনা, মুখে কিছু দিতেন কিনা, এসব জানার ইচ্ছা ছিল না, কাউকে জিজ্ঞাসাও করিনি উনি কেমন আছেন। এর বছর তিনেক পরে একদিন খবর পেয়েছিলাম মালতীদি মারা গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের উপসংহারে বলা হয়েছে-"কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই। এর-

অনুকরণে ডায়েরীর পাতায় কবে যেন লিখে রেখেছিলাম মালতীদি দীর্ঘদিন মরিয়া গিয়াছিলেন, এই প্রথম বাঁচিলেন। জীবনের শত গ্লানি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উদ্বেগ এসবের হাত থেকে চিরমুক্তি ওকে নিশ্চতভাবে প্রশান্ত জীবনের পথে এগিয়ে দিল। গড়পড়তা ও ক্ষতিপূরণের মতবাদ ওর জীবনেও প্রতিষ্ঠিত হোল, মালতীদি ক্ষতিপূরণ মূল্য পেলেন দেহান্তরের মাঝে।

তবুও গভীর আশংকায়, দুরুদুরু বুকে, ঘুমজাগরণে কান পেতে শুনি আবার কোনো মালতীদি সংসারে ফিরে এলো কিনা, না এলে সকলের সাথে আমিও সুখী হব।

বিয়োগ থেকে যোগ

(সাত)

দেশ থেকে মার্কসীট নিয়ে, ঠিক সময় মত সমর এসে কাজে যোগ দেয়। বাড়ীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুরের সময় সে অবশ্য করে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে অজিতের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু কই, কোথায় অজিত? সেকি, এই বিশাল কলিকাতা শহরে হারিয়ে গেল? কোথায় বা তার খোঁজ করবে সে? শহরটা কি একটুখানি জায়গা? এখানে পাশের বাড়ীর লোকই পাশের বাড়ীর খবর রাখে না, তা সে তো কোন ছার। প্রতি বৃহস্পতিবার যায় আর বিফল হয়ে ফিরে আসে সে। একটু যেন হতাশ হয়ে পড়ে। তবে কি এই রকম চাকর হয়েই জীবন কাটাতে হবে? এম, এ-তে চান্স পাবে না তারা?

এই রকম চিন্তায় চিন্তায় রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। প্রায় দুমাস অতিবাহিত হয় একদিন বিকালের বাজার করার জন্য থলি

হাতে বেরিয়েছে, বাড়ী থেকে বেশ কিছু দূর গেছে হঠাৎ চমকে উঠে দেখলো, একটা প্রাইভেটকার তার গা ঘেঁষে ব্রেক করে, শব্দ তুলে পাশে এসে দাঁড়ালো। সবিস্ময়ে সে দেখলো, অজিত ড্রাইভারের সীটে বসে দরজাটা খুলে দিয়ে বলছে, এই সমর, আয় আয় ভিতরে উঠে আয়। সে কিছু বোঝবার আগেই অজিত পুনরায় বললো, শুনতে পাচ্ছিস না। উঠে আয় ঐ পার্কে গিয়ে একটু বসে সবই তোকে বলবো, অনেক কথা আছে।

সে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেল। উৎগ্রীব হয়ে শশব্যস্তে সে ভিতরে উঠে বসলো ও দরজাটা বন্ধ করে দিল। গাড়ী চলতে লাগলো। যে দেশপ্রিয় পার্কে তার এই জীবন আরম্ভ হয়েছিল, সেই চোরের পাল্লায় পড়ে, সেই পার্কের সেই বেঞ্চে গিয়ে দুজনে বসলো। যেন দুজনে দুজনকে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে সমরেশ অজিতের দিকে তাকিয়ে বললো, দেখে মনে হয় তুই তো বেশ ভালই আছিস। লাইব্রেরীতে যাচ্ছিস না কেন?

অজিত বললো, তোর কথা আগে বল। আমি পরে সব বলবো। সে সব অনেক কথা। আগে তোরটা শুনি।

হাসতে হাসতে সমর বললো, আমি বাজারে এসেছি। চাকরের কাজ করছি। তিনশ টাকা মাইনে, আর খাওয়া পরা, এখন বেশ ভাল আছি। পরে একটু একটু করে তার অভিজ্ঞতার কথা সবই বললো। শুনে অজিত মৃদু মৃদু হেসে বললো, বাড়ী গেলি, মামা ও মামিমা তোকে কোন প্রশ্ন করেনি?

করেনি আবার? বলেছি আমি এদের বাড়ীতে থেকে খেয়ে, পরিবর্তে এদের মেয়েটাকে পড়িয়ে মেয়েটার বাবাকে দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির চেষ্টা করছি।

অজিত বললো, সে সব তোর ভাবতে হবে না। আমি দুজনের জন্যে আমার কর্তাকে বলে রেখেছি। এখন তোর খোঁজে গরু খোঁজা করে মরছি। এই কয়দিনের মধ্যে না পেলে

হয়তো সবই ভেস্তে যেত।

উদ্‌গ্রীব হয়ে সমরেশ বললো, বল, বল আর তর সইছে না। আরম্ভ কর। দেরী হলে গিন্নিমা ভাববেন।

ধীরে ধীরে অজিত আরম্ভ করে। সেই যে শিয়ালদহ ষ্টেশান থেকে বেরোলাম, তারপর শুধু হাঁটা আর হাঁটা, একটা করে মোটর গ্যারেজে যাই ও শুনি ড্রাইভার লাগবে না। হতাশ হই। আবার যাই। এই ভাবে হোটেলে খেয়ে লোকের বাড়ীর দাওয়ায় শুয়ে তিন দিন তিন রাত কাটালাম। একটা চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছি, সঙ্গে সুটকেশটা আছে। সেটাই রাত্রে শোবার বালিশ। দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা দাদা, আমি পাড়াগাঁ থেকে এসেছি, ড্রাইভারী জানি। একটা মোটর সারাই গ্যারেজের সন্ধান দিতে পারেন? গাড়ী সারাব আর ড্রাইভারী করবো, দয়াকরে বলতে পারেন?

চোখদুটো বড় বড় করে সে বললো, পারবেন? মার খেয়ে কাজ করতে পারবেন?

কেন! কেন? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম?

দোকানি বললো, দেখুন তালতলায় একটা গ্যারেজ আছে। মালিকের নাম কেষ্টদা, খুব মালখোর। যদি মুড়ে থাকে তাহলে প্রথমেই দু একটা চড় চাপড় খেতে হবে। পরে, চুমু খেয়ে আদর করবে। তবে সহ্য করতে পারলে তো? যদি প্রতিবাদ করেন তাহলে কী মার যে খাবেন তার ইয়ত্তা নেই।

কেন! মারবে কেন? উৎসুক প্রশ্ন।

ঐ তো, ঐতো, গোড়ায় অত বিস্ময় যদি হয় তাহলে তো পাশ করতে পারবেন না।

তার কথা কি জানেন? যে শালা আসবে সে শালাই সব চোর। কিছু দিনের জন্যে এসে আমার ক্যাশ নিয়ে পালাবে তাই আগে থেকেই থেট্‌নিং দিয়ে নিই। যদি সহ্য করে থাকে তাহলে

বুঝবো টিকবে, না হলে টিকবে না।

সে আবার কি? তাহলে পরে যদি কোন লোক বিশ্বাস-ঘাতকতা করে? প্রথমে মার খায় সেও ভালো। সহ্য করে থাকবে। পরে সুদে-আসলে শোধ করে নিয়ে আসবে। তখন কি হবে? আরে সে তো আমিও জানি। তবে সেটাই ওর—ভিউ, যে নাকি মার খেয়েও থাকে, সে কাজ শেখার জন্যই থাকে, সে চোর হয় না।

ভালো। দয়াকরে বলে দিলেন। এখন দেখি কি হয়? ঠিকানাটা?

দোকানি বললো, কোন ঠিকানা আর নম্বরের দরকারই নেই। তালতলায় গিয়ে শুধু বলবেন, কেষ্ট চাটুজ্যের গ্যারেজ। ব্যাস, কানা লোকও দেখিয়ে দেবে। মোটরের মালিকরা জানে চাটুজ্যের যে কথা সেই কাজ। কাজে কোনো চুরি জোচ্চুরি নেই, দামও রিলায়েবল।

চললাম কেষ্ট চাটুজ্যের গ্যারেজে ভয় ও বিস্ময় নিয়ে। জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে? মার না আদর কোনটা?

সবিস্ময়ে সমরেশ প্রশ্ন করলো, তারপর কি হোলো? তাড়াতাড়ি বলো আমার আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

(আট)

বেশী খুঁজতে হোলো না। তালতলার ভিতরের দিকে, বিরাট একটা জায়গায় চতুর্দিকে টীনের শেড্। ভিতরে মাঝে খানিকটা ফাঁকা উঠোন মতো। প্রায় দশ-বারোখানা মোটর, ট্যাক্সি, জীপ ঠাসাঠাসি করে—তার ভিতরে ঢোকানো। উঠোনেও তিন-চার খানায় কাজ হচ্ছে। কোনোটার বডির কাজ, কোনোটায় রংএর কাজ। আবার কোনটায় বা ইঞ্জিন ও কোনটায় গীয়ার ঠক্ ঠক্ হাতুড়ির ঘা পড়ছে, ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে। সে এক

এলাহি কাণ্ড আর কি। ভিতরে গিয়ে চতুর্দিকে দেখছি এমন সময় সারা গায় কালিঝুলি মাখা, একটি ছোকরা আমায় এসে প্রশ্ন করলো, কি চাই?

আমতা আমতা করে বললাম, কেষ্টদা কোথায়, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। একটু দরকার আছে।

ছেলেটা হাসতে হাসতে বললো, কি দরকার? কোনো গাড়ীর কাজ করাবেন?

না না, আমি তাঁর কাছে এসেছি নিজের প্রয়োজনে। যদি একটা ড্রাইভারী বা এই কারখানার কাজ থাকে করতে পারি এই আর কি?

পিঠে তেল দিয়ে এসেছেন? যুবকটি তামাশা করেই বললো।

কেন? কেন ওকথা বলছো?

যান না ভিতরে যান, গেলেই বুঝতে পারবেন। তার থেকে কেটে পড়ুন যদি ভাল চান।

আমি বলি, না আমি তাঁর কাছে যাবোই। তুমি বলো, তিনি কোথায় আছেন?

আঙ্গুল দিয়ে যুবকটি কোনার দিকে ঘর দেখিয়ে চলে গেল। আমি বুক দুরু দুরু করে সেই কোণের ঘরে চললাম। গিয়ে দেখলাম ভিতরে মেঝেয় মাদুর পেতে একটা কুৎসিত লোক মদে চুর হয়ে বসে আছে, ডান হাতে তখনও একটা বোতল ধরা। খুব ষণ্ডা মতো, চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল। আমাকে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিকৃত স্বরে প্রশ্ন করলো, কে রে ওখানে? কে তুমি?

ভয়ে ভীত আমি কাঁপতে কাঁপতে বললাম, কেষ্টদা আমি, মানে আমি আপনার কাছে এসেছি কাজের জন্য। যদি একটা কাজ করে দেন...

আমার কথার মাঝেই তার ডান হাতের বোতলটা সজোরে

আমার মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। বোতলটা আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল। তেমনি বিকৃত স্বরে আবার বললো, মজা দেখতে এসেছো? আমি তোমার কাজ করে দেবো? নবাব বাচ্ছা, আমায় ফাঁসাতে এসেছো? আমার ক্যাশ ভাঙ্গতে? —এই বলে হাতের কাছে আর একটা খালি বোতল ছিল সেটাও ছুঁড়ে দিলো। সেটা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হোলো না। আমার কপালে সজোরে এসে আঘাত করলো। উঃ মাগো, বলে কপালে হাত দিয়ে দেখলাম। মনে হোলো খুব খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। সেখানেই বসে পড়লাম। তাতেও নিস্তার নেই। সেই মত্ত লোকটা এতক্ষণে উঠে এলো। আমার উপর কীল, চড় লাথি এলোপাথাড়ি মারতে লাগলো। উবু হয়ে বসে দুটো হাঁটুর ফাঁকে মুখটা দিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করতে করতে এক সময় অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোলো দেখলাম সেই ঘরেরই এক কোনে একটা খাটিয়ায় শুয়ে আমি যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছি আর আমার মুখের উপর সেই বীভৎস মুখটা নীচু হয়ে এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। ঐ দৃশ্য দেখে ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেললাম।

এবারে বেশ মার্জিত এবং মোলায়েম স্বরে সেই লোকটি বলতে লাগলো, এই ওঠ ওঠ, উঠে বোস। ওষুধটা একটু বেশী মাত্রায় পড়েছে। ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি।

মুখ বিকৃত করে দুহাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না।

এতক্ষণে সে আমার পিঠে একটা হাত দিয়ে টেনে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিয়ে, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে বললো, হ্যাঁরে খুব লেগেছে?

আমার গলায় স্বর ফুটছে না। তবু বললাম, না কেষ্টদা লাগেনি।

এতক্ষণে ডান হাত দিয়ে নিজের কপাল স্পর্শ করে বুঝলাম কপালের ক্ষতটায় কখন সে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। আর কি যেন ওষুধ খাইয়েও দিয়েছে। সত্যই গায়ের ব্যথা মনে হোলো একটু কমে আসছে। তার দিকে চেয়ে স্পষ্ট করে বললাম, না কেষ্টদা সত্যই আমার লাগে নি। হয়তো আপনারই হাতে লেগেছে দেখুন। বলে মৃদু হাসলাম।

কি আশ্চর্য। এতক্ষণে ঐ গুণ্ডা লোকটা সত্যই ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো। আমাকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে— বলতে লাগলো, ভাইরে আমায় ক্ষমা কর, আমি একটা পাষণ্ড, আমি তোকে সত্যই কাজ শেখাবো। তুই আজ শুয়ে থাক কাল থেকে তোকে ভেজিয়ে দেবো।

আমিও তার এই ব্যতিক্রম দেখে আশ্চর্য হয়ে শুয়ে পড়লাম।

সেদিন কেষ্টদা আমাকে কাছে করে নিয়ে রাত্রে শুলো। শুয়ে শুয়ে কি সব আগড়ুম বাগড়ুম বলছে কিছু কিছু আমার কানে ঢুকছে আর কিছু কিছু ঢুকছে না। এক সময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না।

সকালে আমার গা ঠেলে কেষ্টদা আমায় ডাকলো,—এই ওঠ, ওঠ, তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে রেডি হয়ে নে। এখুনি কাজে ভেজবি। এখন কোনো মাইনে নয়। যদি কোন দিন কোন গাড়ী নিয়ে বোরোস, সেদিন পুরো রোজ পাবি। লাইসেন্স আছে?

আমার বাড়ীতে করানো লাইসেন্স আছে, তাই চেপে গিয়ে বললাম, নেই।

আচ্ছা ও আমি করিয়ে নেবো। ভাল চালাতে পারিস? বাস, লরী সবকিছু?

না আমি লাইট গাড়ী চালাই। মোটর, ট্যাক্সি, টেম্পো এই সব।

ঠিক আছে। এখন কিছু কিছু মেকানিজম শিখে নে। দেখি ইতি মধ্যে কি করতে পারি ?

আমার এত আনন্দ হোলো, গত কালকার মার খাওয়ার যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলাম। কেষ্টদার সঙ্গে গিয়ে গাড়ীর নীচে শুয়ে পড়লাম।

এই ভাবে কোনো দিন গাড়ীর কাজ করি। কোনো দিন বা ড্রাইভারী করতে ঠিকাতে অন্য গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সে দিন কেষ্টদার কাছে আমার মজুরির চল্লিশটা টাকা বুঝেনি। হাসতে হাসতে কেষ্টদা বলে, কিরে তেলের হিসাব ঠিক ঠিক আছে তো ? না কি কিছু ম্যানেজ করেছিস ? পরে নিজেই আবার বলে, না না তোকে দেখে আর যাই মনে হোক চোর বলে মনে হয় না। তুই ঠিক পারবি জানিস ?

সেটা তোমার দয়া, কেষ্টদা। (ক্রমশ)

অনুরাগ

বইপাড়ায় প্রাপ্তিস্থান :

লিট্‌ল ম্যাগাজিন স্টল

রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, স্টল নং ৫৬

কলিকাতা-৭০০০০৯

লিটল ম্যাগাজিন ও স্বউদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের প্রচার ও বিক্রয়ের একমাত্র দায়বদ্ধ অব্যবসায়িক উদ্যোগ—

রা ম ধ নু

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২, এস. পি. সি. ব্লক, কাজিপাড়া

যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৯২

তিন কপি করে পত্রিকা ও বই পাঠানো যেতে পারে। বিক্রি হয়ে গেলে যথা সময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়।

দুপাশে আঁধার নীরেন্দ্র গুপ্ত

এপাশে আঁধার ওপাশে আঁধার
মাঝখানে শুধু আলো,
তবু তাই নিয়ে কত আয়োজন
কত সাজ জমকালো।
তাই নিয়ে আশা কত ভালোবাসা
কত ভাঙা-গড়া খেলা,
তাসের প্রাসাদে ছায়া নিয়ে কাটে
সম্মোহনের বেলা।

ছোট হয়ে আসে আলোর বৃত্ত
আঁধার-বলয় ঘিরে,
হয় না স্মরণ কোন্ পথ ধরে
যেতে হবে কোথা ফিরে।

ঘুমাও ঘুমাও পথভোলা মন
আঁকো স্বপনের ছবি,
আজীবন শেখা মোহিনী কথার
মালা গাঁথ তুমি কবি।
তোমার খেলার সাথী করে আর
আমায় রেখো না ধরে,
আলোর ওপারে অকূল আঁধারে
নিয়েছি দুচোখ ভরে।

এই পৃথিবীকে ভালোবেসে লেখা দে

তোমার কাছে চেয়েছিলাম বৈজয়ন্তী-মালা
ফিরিয়ে দিলে ঘৃণা,
তোমার কাছে গেয়েছিলেম রসন্ত-রাগ
ফিরিয়ে দিলে বীণা।
তোমায় দিয়েছিলাম গোলাপ এবং হাস্নুহানা
ফিরিয়ে দিলে কাঁটা,
তোমার পাশে পথ করে হেঁটেছিলেম
ফিরিয়ে দিলে হাঁটা।
তোমায় লিখেছিলেম গোপন কথা, পদ্যাকারে
ফিরিয়ে দিলে গাথা,
তোমার কাছে চেয়েছিলেম মাঙ্গলিকতা
ফিরিয়ে দিলে তোমার প্রাচীনতা॥

ইঁটভাটার কথা দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতের তালু ঘষে মসৃণ করতে গিয়ে
দেখি, উল্টোপিঠে স্পষ্ট গাঁটগুলো

ঢাকে কাঠি পড়তে না পড়তেই
ভন ভন ক'রে উড়ে বেড়ায় মাছি
কাজ নেই—মজুরী নেই—মূল্য নেই
পৃথিবীর ঘূর্ণিতে পা রাখাই দায়

আমরা পেরিয়ে এসেছি প্রস্তরযুগ
আবিষ্কার করেছি জ্বলজ্যান্ত আগুন
কিন্তু, আবহাওয়ার অনুকম্পা গেঁটেবাতের মতো
তাই হালখাতায় লিখতে হয় হলফনামা

তবু মনে রাখবেন মান্যবরেরা
পচা শামুকের খোলাতেও পা কাটে

নেতার হাটে সকাল মাধুরী সিংহ

ঢিলেঢালা ঠাণ্ডা ভোর
ভিজে কুয়াশার মিহি ঘেরাটোপ ছিঁড়তে খুঁড়তে
বেড়া দেওয়া জমি
সর্ষেক্ষেতের হলুদ সবুজ ছক
সারি বেঁধে আছে নাশপাতি গাছ
বাদামি সোনালি পাতাগুলো সব এড়ালে সেড়ালে
হাওয়ার ঠেলায় ঝরে যেতে যেতে ঘুরপাক খায়
গড়ায় ছড়ায় এলোমেলো হয়ে
চীড় পাইনের দীঘল শাখায় সাবলীল বীথি
নাগাল ছাড়িয়ে উপরে কত না ফল ধরে আছে
ঝুপ করে পড়ে পাহাড়ের ঢালে গড়াতে গড়াতে
সিঁদুরে রাঙানো জংলি ফুলের ঘন কাঁটাঝাড়ে
খেই হারাতেই...সব চুপচাপ...
ফের ঢিলেঢালা ঠাণ্ডা সকাল

হার-জিৎ ধরিত্রী চক্রবর্তী

পূবদিগন্তে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বললাম আমি
দেখ, রোজ তুমি হেরে যাও, আমি উঠি আগে।
সব কাজ হয়ে যায় সারা, তবে ওঠো তুমি।

সে বললো হেসে, তুমি তো দেখ শুধু চোখের সামনে,
চাওনা পিছন পানে, চাইলে দেখতে পেতে—
সেখানে সারাদিন কাজ করে, এনে দিয়ে রাতের ঘুম,
তবে আসি এখানে, তোমাদের ঘুম হতে জাগাতে।

আমি বলি, না, তুমি বলছ না ঠিক।
আমিই তো চলি, দিনরাত, পরিক্রমা চলে আমার তোমাকে
ঘিরে
তুমি তো দাঁড়িয়ে থাকো, ধীর, স্থির অটল মহিমায়।

সকৌতুকে বলল সে, বোঝ তবে, কে জিতে গেল, হারলো,
বা-কে!

না, তাও ঠিক নয়, বললো সে আবার—
তুমি ছাড়া আমি শুধু অগ্নিপিণ্ড এক,
আমার সকল রূপ তোমাতে প্রকাশ।

অপেক্ষা ওমর আলী

হে সুসময় হে শুভ তোমার পথের পাশে কতোকাল
ফুটে থাকলাম
তোমাকে সুগন্ধে তুলবো ধুয়ে
কতোকাল ফুটে থাকলাম
ক্ষমা হয়েছি অপরাধ করোনি দ্রৌপদীর কাছে কীচকের মতো
তবু ও

অন্তত একবার অপরাধ করো
অপরাধ করেছিলে এটুকু বলতে পারতাম রাজসভার সামনে
অমন ধুলোয় ফেলে দিয়েছিলে আহত করেছিলে
এবার চাষ করো উর্বরা হয়েছি শরীর ভিজিয়েছি দৃষ্টি থেকে
তরল লবণে

বয়ে যেতে পারো প্রখর উজান বোয়ালদহের শিলাইদহের পাশ দিয়ে
বাতাস ধরেছি মাস্তুলে আর বুক ফোলা পালে
অন্তত একবার বয়ে যাও রূপপুরে
তোমার পথের পাশে অপেক্ষায় কতোকাল দাঁড়িয়ে থাকলাম
শ্রুবাবতীর মতো

শরীরের বিভিন্ন শাখার হাতছানি
তোমাকে সুগন্ধে তুলবো ধুয়ে
ভেতরে ভেতরে লাল আগুন হয়েছি নেভাতে আসোনি
সাঁব তো পুড়েছে দুটো পা জঘন পর্যন্ত
চোখের নীচেই সেই দহন কাজল
চোখ থেকে নামিয়ে দিয়েছি এক বর্ষা জল
ভিজিয়ে ফেলেছি শরীরের চৈত্রফাটা নামিয়ে দিয়েছি
দেখো ঢল

এবার চাষ করো উর্বরা হয়েছি ধান বোনো
চারাগুলো বড়ো করে তোলো
দেখো আমি বারো বছর তোমার অপেক্ষায় সিদ্ধ করছি
শ্রুবাবতীর মতো কঠোর সঞ্চিত যৌবন...

লীলামঞ্জরী সুধা চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বপ্রকৃতি মিলনবাসর রচিল সুনীল আকাশে
গ্রহ কি গ্রহণ করিল তাহার চিরবাঞ্ছিত বধূকে।
ধূমকেতু ধূম জাগাল যে মনে মনে
নেপথ্যে কোন নাট্যকারের সাদর অমন্ত্রণে।
শুভ্র পুচ্ছ তুলিল উচ্চে পুলকে পলক ফেলিতে পলকে মিলাল
চির তৃষিত করিয়া আঁখিকে।
মর্ত্যবাসীর নয়ন হল না নত
তাদেরও কি শুভদৃষ্টি হল গো ঐ গ্রহদের মত ?
উল্কা সখীরা আলপনা আঁকে ঐ নভোমণ্ডলে
আলোক-ঝর্ণা ঝরায় কি তারা পরম কৌতূহলে।
বাজে কঙ্কন ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
নৃত্যরতার উঠে দুলে ঐ কাল কুন্তলা বেণী।
ঊষার রক্ত আলোকে জড়ান, ওড়না আঁচল দোলে
নূপুরের তালে তালে স্বর্ণবর্ণা আলোক কুসুম মাল্যে,
রবি নিল দোঁহে কণ্ঠে দুদুল দোলায়ে।
সাগর সিন্ধু উছলি উছলি লহরী তুলিয়া ধায়
কল কল কল ছল ছল ছল সুমধুর গীত গায়।
স্নিগ্ধ সমীরে তরুশাখা দোলে পর্ণেতে দেয় তালি
দিগ্‌বধূরা যে আনন্দে জ্বালে তারকার দীপাবলী।
অতি অপরূপা মনোলোভা রূপে মুগ্ধ যে জনমন
সার্থক হল মানব জন্ম এ যে দেবলীলা নিকেতন।
মন হতে যায় মলিনতা মুছে যদিও ক্ষণেক জন্য
বিস্মিত মন সমস্বরে বলে দর্শনে চিরধন্য।

তোমার কাছে রাখি কামরুন নাহার হেনা

তেমন কিছুই নেই
নির্জন কথাগুলিই না হয়
তোমার কাছে রাখো
জীবনের দেনা-পাওনা
সদর দরজায় দেখো
তবুও কাছাকাছি
তুমি আর আমি
দূরের আওয়াজে
হৃদয় খুলে রাখি
তেমন কিছুই নেই
অকারণ কেঁদে উঠি
সবুজ পাতার গন্ধ
চারিদিক নিঃশব্দ
কি জানি কোথায় আছি
জোনাকী ডাহুকের কাছাকাছি
সব তৃষ্ণা একে একে ঝরে
জীবনের সুখ-দুঃখ
উজান ভাটিতে চলে।

ত্রিস্তর রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

যারা উঠেগেছে তারা তো স্থিতি স্থাপক
হয়ে আছে, যারা ঝুলছে তারাই মুখিয়ে ;
একটু চাপুন ডান দিকে ফিরে চুকুক
এখনো ঐ তো খালি আছে—দেন দেখিয়ে।

যারা উঠে গেছে আর যারাই উঠছে
পথ ফেলে রেখে ঘরে ফিরে যেতে
তারাই ব্যাস্ত দু'হাতে জরিপ করছে
শেষতকে কী কী...কতটা জোটেনি হাতে।

যার ফেরা নেই অকুতোভয়েই একা
সে থাকে দাঁড়িয়ে বীর বলো বীর না বলো—বোকা !

সূর্য বন্দনা সেন (মিষ্টি)

সূর্য ! তুমি অস্ত কেন যাও !
পৃথিবীটাকে অন্ধকার করে কি আনন্দ পাও
প্রকৃতির এই নিয়মটা পারতে যদি ভাঙতে,
তবেই তো পৃথিবীটাকে অন্ধকার পারতো না ঢাকতে।
উষালগ্নে তুমি ছড়াও তোমার রক্তিমা,
তোমার উদয়ে শুরু হয় দিনের মহিমা।
মধ্যদিনে পাই তোমার প্রচণ্ড তাপ,
তখনই বোঝা যায় তোমার কত দাপ।

অপরাহ্নে তুমি ঢলে পড়ো সাগরের কোলে,
অহংকারটাকে কেন তুমি ফেলে দাও জলে ?
তোমার অস্তে নেমে আসে জগতে অন্ধকার,
কুকর্মের তখনই খুলে বন্ধদ্বার।
তাই তো তোমায় মানা করি অস্ত যেতে,
তোমার দীপ্তি নিয়ে থাকুক সবাই মেতে ॥

হৃদয়ের বিষণ্ন প্রতিমা সুচন্দ্রনাথ দাস

মাকড়সার জালে আটকে গেছে
স্বপ্নের রঙিন প্রজাপতি,
পঞ্জিকার অমৃতযোগেও
কপালে লাগবে না চাঁদের তিলক।

মেঘেদের খরগোশ দেখতে চেয়ে
আকাশের দিকে চোখ মেলি...
সেখানে কার অদৃশ্য তুলি আঁকে
হৃদয়ের বিষণ্ন প্রতিমা।

শূন্যের ভিতরে হাত নেড়ে
যেন এক পাল্কির দরজা খুলে দেখি···
শিশিরের সঙ্গে অশ্রু সন্ধি করে,
আয়না দেখাতে চায় মায়ামুখ।

কিছু যে নেই তা নয়, স্বপ্ন ছাড়া অনেক কিছু,
অনেক স্তুতি ও ঘৃণার থুতু।
মিছিল-কোলাহলহীন দেবদারু-ছায়া
তারই খোঁজ করি মাঝে মাঝে।

কখন আমি অভীক গঙ্গোপাধ্যায়

সংশয় তখনি
যখনি নিজেকে নিজের করে ভাবি।
আমি কি একান্তই আমার ?
ডুবুরির মত মুক্তোর খোঁজে হাতড়াই
চেতনার গভীর প্রবাহকে,
বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে আনি
শৌখিন মৃত প্রবাল
ঝাঁকে ঝাঁকে।
অনুভূতি ও কর্তব্যের বুদবুদগুলো
ওঠে নামে, ভাসে-ফেরে অবিরত...
কোথায় আমার আমি ?
এক সুসুপ্তির অন্ধকারে যেন প্রমিথিউস শৃংখলিত
ডাকলে সাড়া দেয়
সাড়া দেয় একমাত্র কল্পলোক থেকে প্রতিধ্বনি,
অর্গলে বাধা পড়া আমার আমি
প্রতিধ্বনিত হয় শৃংখলে, গোপনে।

বইমেলা ১৯৯৯ কণিকা সোম

এ বছর ময়দানে, বইয়ের মেলার টানে
প্রথম এলেন শেখ হাসিনা,
ঠেলাঠেলি গালাগাল, সাংবাদিক নাজেহাল
খবরটা তরতাজা, বাসি না।

দিল মালা দিল ফুল, সম্বোধনে হলো ভুল
বেমালুম শুনে যাই, হাসি না,
দেশটা হয়েছে ভাগ, আছে তবু অনুরাগ
প্রতিবেশীকে কি ভালবাসি না ?
মার্জনা করে দিও, প্রীতি ভালবাসা নিও
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ॥

কবি–লেখক অন্নদাশংকর রায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

অর্চিতা রায়চৌধুরী

কবি-লেখক অন্নদাশংকর রায় জন্মেছিলেন উড়িষ্যার কটকে
কিন্তু সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন বাংলার শহর কলকাতায়।
পড়া-লেখা শেষ করে হলেন দক্ষ প্রশাসক,
করলেন বিয়ে এরপর বিদেশিনী এক নারীকে।
চাকরি ছেড়ে কলম নিলেন হাতে, হলেন সাহিত্যিক,
গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখলেন একে একে অনেক।
ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর জাপান ভ্রমণ শেষে লিখলেন কবিতা,
যুক্তবঙ্গের স্মৃতিতে ঘেরা তাঁর ভ্রমণের কবিতা।
পেয়েছেন তিনি নানান সম্মান, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার,
পনেরই মার্চ-শুভ জন্মদিনে তাঁকে প্রণাম জানাই বারবার।
আগুন নিয়ে, পুতুল নিয়ে খেলার পর
রত্ন ও শ্রীমতী, সত্যাসত্য-চমৎকার।
কবিতা আর ছড়ায় ভরা ভাণ্ডার যার,
তাঁকে নিয়েই গর্ব আমাদের খণ্ডিত বাংলার।

আত্মীয়তা গোপালকৃষ্ণ গুহ

তোমার ডাক আমি সর্বদাই শুনি
দেহের ভিতর মনের ভিতর।
অন্তরের অভ্যন্তরে সে ডাক
মাঝে মাঝে আমাকে উতলা করে,
আমি সেকথা উপলব্ধি করি
নিজে নিজে নির্জনতার নিবিড় নিরিখে।

বিষণ্ণ বিকেল অথবা
কোন সময় স্বীয় অবসন্ন সরলতা
আমাকে হাহাকার বিদ্ধ করে ।
শালীনতার মুখোস খুলে।
আমি খেয়ালী পুরুষ হয়ে
দাঁড়াই আমার মুখোমুখি
আর ডাকে সাড়া দিতে
অন্য মানুষ হয়ে যাই।

তোমার সাথে আত্মীয়তা আছে।
আমি মত্ত থাকি অনাত্মীয়
বস্তুনিষ্ঠ এক দৈনন্দিন আসরে।
আর আচমকা
তোমার ডাক আমি শুনতে পাই
নিয়তই নির্জন মনের ভিতর
দেহের ভিতর দারুণ দহনে
নিরালায় অভ্যন্তরে।

ফিরিওয়ালা বাজীরাও সেন

এখন দুপুর দ্যাখো—ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙাচোরা বাসন কোশন
ফিরিওলা ঐ ডেকে যায়, ফুল চাই—মাটির পুতুল।
কি নিই কি নিই আমি, কি জমেছে আবর্জনা স্তূপে
কার সাথে কার বিনিময় ? কি সঞ্চয় মিথ্যে অর্থহীন ?
জীবনের ভাঙ্গা পাদপীঠে কত আছে শস্যশূন্য মাঠ
শ্যামলতা চুরি গেলে দিনপঞ্জী জমাট কুয়াশা
অথচ তা ভালো লাগে অসমাপ্ত যত টুকিটাকি
একরাশ রাঙানো আগুন যেন হয়তো বা তার চেয়েও দামী
ফুল কিম্বা পুতেলের প্রসাধিত শিল্প কিছু নয়।
স্মৃতির মঞ্জুষাময় এই সব জঞ্জালেরা থাক্
ফিরিওয়ালা যাক্ ফিরে যাক্।

পুস্তক পরিচয় প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কালো অধ্যায় ও কলঙ্ক। শ্রীমতী লেখা দে সম্পাদিত। শ্রী অরবিন্দ নারী চেতনা ও চিন্তা কেন্দ্র, নেলীপিডস্, রুম নং—৯ বি, বালিগঞ্জ বিজন সেতু ভায়া ডাক্ট, কলিকাতা-১৯, দেড়শো পৃষ্ঠা। পঞ্চাশ টাকা।

এই সেই বিজন সেতু যেখানে কয়েক জন সন্ন্যাসিনীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, এখন সেখান থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে নারী চেতনা ও চিন্তা বিষয়ে মননশীল একটি অতি আবশ্যকীয় সংকলন গ্রন্থ। এতে প্রায় তিরিশটি লেখা রয়েছে।

নারীদের স্বাধীনতা চাই—এমন একটা দাবী আজ পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করে উন্নত দেশ ইউরোপ আমেরিকায়। শিশুদের স্বাধীনতা, বৃদ্ধদের স্বাধীনতা—এই সব কথাও কোথাও কোথাও

শোনা যায়। আসলে এ সব মানবিক মূল্যবোধের মধ্যেই পড়ে। এর জন্য আলাদা করে আন্দোলন করা কি খুব দরকার?

নারী নির্যাতন, বধূহত্যা—এসব কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। আমরা একবার লেখিকা শৈলজা চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—চার দিকে এত নারীনিগ্রহ চলছে আর তার মধ্যে বসে এত মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের গল্প লিখছেন কি করে?

তিনি উত্তরে বলেছিলেন,—কাগজে পড়ি বটে, কিন্তু আমার চারটি মেয়ে এবং আমার পুত্রবধূ—এরা তো দেখছি সকলেই তাদের সংসারের কর্ত্রী। আমার স্বামী ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গেও কখনো আমার মনোমালিন্য হয় নি। তাহলে আমি নারী-নির্যাতন জানব কি করে? আমার যে অভিজ্ঞতা নেই, সে-বিষয়ে বানিয়ে লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

শৈলজাদির কথা শুনে আমাদের নতুন করে ভাবতে হয়েছে। শহরে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে প্রায়ই আড়াই জন লোকের সংসার ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে। নব বধূ দু-তিন বছরের মধ্যেই স্বামীকে বুঝিয়ে বাবা-মা-ভাই-বোনকে ত্যাগ করে গিয়ে সংসার পাতে স্বাধীন ভাবে। স্বামীরা সকলেই প্রায় স্ত্রীর অধীন। এই গণ্ডীর মধে নারী-নির্যাতন কোথায়?

মনুষ্য-সমাজে ধনী-দরিদ্র, শহুরে-গ্রাম্য, এগিয়ে-পিছিয়ে নানা স্তরের মানুষ আছে। সবার জীবনধারা এক রকম না। সব গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। নির্যাতন হয় দুর্বলের উপর। নির্যাতন করে বলবানেরা। এ কথা ঠিকই কিন্তু তাকে নারী-নির্যাতন রূপে দেখলে কতটা ঠিক দেখা হয় তা ভাববার বিষয়। শিশু সমস্যা, বৃদ্ধ সমস্যা, বিধবা সমস্যা—এ ভাবে না চিন্তা করে মানবিক সমস্যা রূপে বিচার করাই সঙ্গত মনে হয়। দুর্বলের উপরে এই প্রবলের অত্যাচার বন্ধ করবার একমাত্র পথ নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

আমরা আগে কয়েকটি রচনায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। দেশ-কাল-পাত্র বলে একটা কথা আছে। সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকার খবরে দেখলাম,—ইউরোপীয় কৃষ্টির একটি দেশে এক এগারো বছরের মেয়েকে তার ৩৮ বছর বয়স্ক পিতা ধর্ষণ করে প্রাণদণ্ডের আদেশ পায় এবং মৃত্যুকালে তার শেষইচ্ছা পুরণের কথা সে জানায়,—মেয়ের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ...এই সকল ঘটনা খুব মর্মপীড়াদায়ক। মানুষমাত্রই এমন ঘটনার জন্য দুঃখ বোধ করবে। কিন্তু সঙ্গে এটাও খতিয়ে দেখা দরকার,—কোথায় কেমন অবস্থায় কোন্ লোকের দ্বারা এই পাপটি সংঘটিত হয়েছে!

পৃথিবীর মানুষ্য জাতির মধ্যে অর্ধেক নারী। তাদের সমস্যা সহৃদয় ভাবে বিচার না করলে মনুষ্য সমাজ শান্তি পাবে কি করে? একটু স্থির ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়,—আমাদের অভ্যন্তরেই এর সমাধান লুকিয়ে রয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দেখছি,—নারী আদর্শ। নারীজাতির নম্রতা, করুণা, স্নেহ ও সেবাপরায়ণতা তাদের কাম্য। তাঁরা নারীত্বের অনুশীলন করে আদর্শ নারী হতে চাইছেন। যশোদার স্নেহে তাঁরা গোপাল সেবা করেন। গোপীগণের মঞ্জরী ভাবে রাধাকৃষ্ণের নিষ্কাম-সেবা তাঁদের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম। বাকি নরনারী সকলেই প্রকৃতি।...ভজন পথে নারীজাতি অন্তত এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। পুরুষকে নারীভাবে ভাবিত হতে হচ্ছে আর নারী তো জন্ম থেকেই নারী। এই মতে—সাধকগণ প্রত্যেকেই অন্তশ্চিন্তিত দেহে নারী, কিশোরী। নারীত্বই তাঁদের আদর্শ। এঁদের শিক্ষা হচ্ছে 'প্রেমভক্তির' অনুশীলন। নারীর সৎগুণে বিভূষিত হওয়া। এক কথায় সুভদ্র হওয়া। আর এই ভদ্র হওয়াই তো মনুষ্য-সভ্যতার চরম ও পরম উদ্দেশ্য।

নারী জাতির জন্য এমন একটি সম্মানের ঘটনা পৃথিবীর

আর কোথায় আছে ?

মহৎ মানবিকতার সংগুণে বঞ্চিত হতে না চাইলে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত হবে গোড়ীয় দর্শনের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করা।

কিন্তু তবু বলব, আজকের সমাজের নারীসমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সঠিক হয়েছে। এই সংকলনের লেখাগুলোকে সে দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে।

লেখকদের নামের তালিকায় আছেন নবনীতা দেবসেন, লেখা দে, সুধীর বেরা, চিত্রা দেব, অর্চিতা রায়চৌধুরী, জয়ন্তী সান্যাল, ভারতী দত্ত, কল্যাণী কার্লেকর, বিউটি মজুমদার, ধীরা ভট্টাচার্য, গৌরী মল্লিক, দেববর্মণ, ডলি দত্ত, প্রণতি নন্দী, ইন্দিরা দত্ত, ইরা চক্রবর্তী, চিত্রিতা দে, দীপ্তি দাশগুপ্ত, শিখা গুপ্ত, ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ নারায়ণ দে, গোপাল গুহ, সুস্মিতা ভট্টাচার্য এবং সাক্ষাৎকার দিয়েছেন—প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, মহাশ্বেতা দেবী, ফুলরেণু গুহ ও শ্রীমতী আরতি দত্ত।

বিশ্বের নারী সমাজ, তার অসুবিধা, শারীরিক মানসিক দুর্ভোগ, অসহায়তা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, আইনগত অধিকার, পতিতাবৃত্তি, গণধর্ষণ, বন্দিনী ধর্ষণ, ধর্ষিতা পতিত, পৈত্রিক সম্পত্তি, ডাইনি-কলঙ্ক, মেয়ে পাচার, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক ও আন্তর্জাতিক নারী-সমস্যা নিয়ে তীক্ষ্ণ সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেখকগণ। প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠা ব্যাপী এসব অনুপুঙ্খ আলোচনা চলেছে। নিবন্ধগুলোর শিরোনাম থেকেই তাদের খানিক পরিচয় মিলবে।

ধর্ষণ ; সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি, দেবদাসী, সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পতিতাবৃত্তি, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষ নারীর আইনগত অধিকার ও সামাজিক মূল্যায়ন, নারীমুক্তি অবদলিত, নারী অপরাজিতা, সমাজপ্রসঙ্গ, কয়েকটি মেয়ের কথা, সেকাল ও

একালে নারীমুক্তি, যৌনকর্মীদের সমস্যা ও সমাধান, পণপ্রথা, নারীর স্থান, নারীর চোখে নারী, নারীস্বাধীনতা ও নারীবাদ, পণপ্রথা আইন, নারীপ্রগতি, বর্তমান নারী, নারীচেতনা ও অগ্রগতি।

যত রকম সমস্যা হতে পারে, সামাজিক ও বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে তা নানা ভাবে দেখা হয়েছে এবং তার বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায়। 'কালো অধ্যায় ও কলঙ্ক' নামের সংকলনটির সুপ্রচার কাম্য। ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রকাশিত—সাহিত্যিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত তথ্য ও গবেষণামূলক এই গ্রন্থ। এমন একটি সংকলনের প্রকাশ সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই পরিশ্রমী কাজের জন্য আমরা শ্রীমতী লেখা দে-কে সাধুবাদ জানাই।

অরণ্য থেকে অরণ্যে, প্রথম খণ্ড, সমগ্র সুন্দরবন নিয়ে। নীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গ্রন্থকার কর্তৃক কোদালিয়া এন, এস, বসু রোড, পিন-৭৪৩৩৫০ দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪৪। ৪০ টাকা।

'অনুরাগ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী ধীরা ভট্টাচার্যের সঙ্গে যখন নীতেনবাবু বই ছাপার বিষয়ে আলাপ করতে এসেছিলেন, আমি তাঁকে বলেছিলাম, নিজের টাকায় বই ছাপাবেন না। বিক্রি করতে পারবেন না। ঘরে ডাঁই হয়ে থাকবে, পোকায় কাটবে ইত্যাদি। কিন্তু প্রকাশিত প্রথম খণ্ড হাতে পেয়ে একটানে পুরো বইটি পড়ে ফেললাম এবং তাতে লেখকের মানসিকতা, ধৈর্য, সাহস, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার যে পরিচয় পেলাম, আমার স্থির বিশ্বাস যে তিনি এর পর আরো সাত খণ্ড অবশ্যই প্রকাশ করতে পারবেন এবং বিক্রিও ভালই হবে। অযথা প্রকাশকের পেছনে

না ঘুরে বরং ভালই করেছেন। সব লেখকেরই তো আর সুযোগ সুবিধে এবং আত্মবিশ্বাস সমান নয়।

এই বইতে লেখক অভয়ারণ্য, সুন্দরবনের জীবজন্তু, পশুপাখী, জলজপ্রাণী বিশেষ করে কুমীর এবং বাঘের আর মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহের অপূর্ব বিবরণী দিয়েছেন তা অতীব মনোগ্রাহী হয়েছে। বোকা বাঘ, মানুষ খেকো বাঘ, জেদী বাঘ, জোড়া বাঘের কবলে, সারারাত বাঘের সঙ্গে, কুমীরের লাফ, ডাকাতের হাতে, মৌলীদের সঙ্গে ইত্যাদি এমন সরস ঝরঝরে ভাষায় তিনি লিখেছেন, পড়ে মনে হয়েছে আমিও লেখকের সঙ্গে সে সব ঘুরে দেখে এসেছি। মীরাদি, ধীরাদিও তাঁর সঙ্গে সুন্দরবনে গিয়েছেন শুনে 'অনুরাগ' পত্রিকার পাঠকগণ অবশ্যই রোমাঞ্চিত হবেন।

সর্বশেষে সুন্দরবনের বাসিন্দাদের সমস্যা এবং সুন্দরবন অভয়ারণ্যের উন্নতির জন্যে শ্রীনীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কিছু পরামর্শ ও উপদেশ যা এই বইতে রয়েছে, সরকার বাহাদুর সে সব পরীক্ষা করে দেখলে দেশের উপকার হবে বলেই মনে হয়।

বইটি পড়ে খুবই উপকৃত হয়েছি। শ্রীউত্তরায়ণ চক্রবর্তীর প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ প্রশংসনীয়।

আধুনিক মননে সাহিত্য ভাবনা ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানব গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ পঞ্চাশ টাকা।

আধুনিক মননে সাহিত্য ভাবনা—এই সিরিজে অধ্যাপক মানব গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকজন সাহিত্যরথীকে নিয়ে আলোচনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রথম বই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে

নিয়ে। পর পর আসছেন ঃ বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী। গ্রন্থকার বিভিন্ন চিন্তা-শৃংখলার দ্বারা ঘটনাকে আক্রমণ করে, নির্ভীক ও তীক্ষ্ম মননের সাহায্যে বিষয়-রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি উপন্যাস—পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, অহিংসা, চতুষ্কোণ এবং প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, হলুদ পোড়া, শিল্পী, হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী—ইত্যাদি তেরোটি ছোট-গল্পের আত্মিক বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্য আলোচনায় মানব বাবুর ভাষা ঋজু, তীক্ষ্ম এবং সুদৃঢ়। তাঁর এই আলোচনা-গ্রন্থ সাধারণ পাঠক, ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে যে সাদর অভিনন্দন লাভ করবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অভীক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা বুদ্ধিদীপ্ত।

পুস্তক পরিচয়—ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদীপ ও পতঙ্গ। তেজেন্দ্রলাল মজুমদার। মূল্য ৩০ টাকা

দৌড় প্রকাশনা

অনুরাগের পুস্তক সমালোচনা বিভাগে পূর্বেও আমরা লেখক তেজেন্দ্রলাল মজুমদারের গ্রন্থের আলোচনা করেছি। প্রদীপ ও পতঙ্গ, লেখকের পঞ্চম গ্রন্থ এবং তৃতীয় গল্প সংগ্রহ। লেখকের অন্যান্য সৃষ্টির মত এই সংকলনের গল্পগুলির মধ্যেও প্রধান উপাদান নর ও নারীর সম্পর্ক এবং মানবিক বোধ। প্রথম গল্প 'বিদেশী'তে দয়িতা ও স্ত্রী—এই দুইয়ের টানা পোড়েন খেটে-খাওয়া অশিক্ষিত মানুষ জয়নালের জীবনে প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর টানই জয়লাভ করেছে। 'জননী' গল্পে চিরন্তন প্রতারিতা নারীর সমস্যা, তার সন্তান—

এটিই তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় বার ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা দমিত হয়েছে সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে। এই গল্পে আমরা সন্তানের খাতিরে সর্বত্যাগী মাকে খুঁজে পাই। মধ্যপ্রদেশের বহু লোকাচার ও স্থানীয় প্রথার একটি, আমরা দেখি 'ফিসবীন বাজার' গল্পটিতে। এটি একটি অত্যন্ত কু-প্রথা। একটি সৎ পুলিশ অফিসার পরিকাঠামোর চাপে কি ভাবে স্বার্থান্বেষী অসৎ হয়ে ওঠে বিরূপাক্ষ পতিতুণ্ডি তার দৃষ্টান্ত। 'প্রজাপতির মৃত্যু' গল্পটি একটি মর্মস্পর্শী অবৈধ সম্পর্কের উপর বিন্যস্ত। ভাবতে কষ্টকর হলেও বাস্তবে এমন যে ঘটতে পারে তা মানতেই হয়। 'পুলিশ' গল্পটির মানবিক আবেদন অনস্বীকার্য।

'প্রদীপ ও পতঙ্গ' যার নামে বইটির নামকরণ সেটি বইয়ের মাঝখানে না হয়ে প্রথমে অথবা শেষে হলে যুক্তিযুক্ত হত। গঠন অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের উপর, যেখানে আমরা দেখি দেহের আবেদন অতিক্রম করছে ক্ষুদ্র কামার্ততা। উত্তরণ ঘটছে বৃহত্তর, সার্বিক কল্যাণের পাদপীঠে। জানিনা লেখক বাস্তবে এ রকম চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন কি না, না কি সমস্তটুকুই কল্পনা? মাধবীর মত মহীয়সী নারী-চরিত্র মনে ছাপ ফেলে। বেশীর ভাগ গল্পেই নারী, পুরুষের হাতে ক্রীড়নক,—এটাই ফুটে উঠেছে।

প্রচ্ছদ সুদৃশ্য, বাঁধাই ভাল তবে এবারেও কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ, ইংরেজী শব্দের ভুল লেখা (যথা প্যারালাইসিস, শব্দটি প্যারালিসিস) পীড়াদায়ক। লেখকের অতন্দ্র সাহিত্য চর্চা অক্ষুণ্ণ থাকুক। বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। লেখকের আগামী গ্রন্থে বিষয় বৈচিত্র আশা করি।

প্রাপ্তিস্বীকার

পত্রিকা

□ সাহিত্য চিন্তা। রণেশ দাশগুপ্ত কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত স্মরণ। কল্যাণ চন্দ। ডিসেম্বর, ১৯৯৮, ৩১১ গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭

□ বঙ্গ-বসুন্ধরা। দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। এম. এ জব্বার, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী। নব পর্যায় প্রথম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ও দ্বিতীয় সংখ্যা মাঘ-ফাল্গুন ১৪০৫, প্রতি সংখ্যা ৫ টাকা।

□ একজোট। ঝর্ণা ঘোষ, জ্যোতি ঘোষ। নভেম্বর ১৯৯৮। ফ্ল্যাট নং ৭/৫ এইচ আই জি (এল) বিরাটি আবাসন কলিকাতা-৪৯। ১০ টাকা।

□ সাপ্তাহিক দশদিশা। মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন শরিফ বাচ্চু। ৬০ চামেলীবাগ, শান্তিনগর ঢাকা ১২১৭, সাত টাকা।

□ ধানসিঁড়ি। মোঃ ফজলুল হক। ১০০ নং উলোন, পশ্চিম রামপুর, ঢাকা। ২০ টাকা।

□ স্মরণিকা সাহিত্য পত্র বিশেষ সংখ্যা। ইদ্রিস আলী, পাবনা, বাংলাদেশ। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৮

□ বুলবুল। এস. এম. সিরাজুল ইসলাম, ৬ মৌলভী লেন কলিকাতা-১৬, নজরুল সংখ্যা ১৯৯৮, সাত টাকা।

□ স্বস্তিকা। সনৎকুমার ব্যানার্জী, ২৭/১বি, বিধান সরণি কলিকাতা-৬ প্রজাতন্ত্র সংখ্যা ১৯৯৯, চার টাকা।

□ অর্ক। সত্য বসু। ১৮বি, ভবানন্দ রোড, কলিকাতা-২৬ জানুয়ারি ১৯৯৯, দশ টাকা।

□ অনুপত্রী। ডঃ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতী দীপালি

চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ পল্লী, সিউড়ী, ৭৩ ১১০১, বীরভূম, শারদ অর্ঘ ১৪০৫, আট টাকা।

☐ একটি কবিতা। অরবিন্দ সিংহ, বরাহনগর রেলওয়ে ব্যারাক, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬

☐ উত্তরের হাওয়া। পুষ্পিতা মণ্ডল, শিল্প সমিতি পাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১

☐ সাহিত্য মন্দির। রমা দাসগুপ্তা, ৫/৫ যশোর রোড, কলিকাতা-২৮ বইমেলা সংখ্যা।

☐ ব্রাত্যবার্তা। প্রবীর মাশ্চরক, ২২০ নেতাজী কলোনি, কলিকাতা-৯০, পাঁচ টাকা।

☐ কারুজ। শিমুল মাহমুদ, আমির ভিলা, ডিগ্রি কলেজ রোড, রাধানগর, পাবনা, বাংলাদেশ। কুড়ি টাকা।

☐ জেলাবার্তা। বিজয় চট্টোপাধ্যায়, ২৭ রামনারায়ণ পল্লী, সরশুনা, কলকাতা-৬১, এক টাকা।

☐ ভিটেমাটি। হরিচরণ সরকার মণ্ডল, কালিয়াচক, মালদহ-৭৩২২০১, নবান্ন সংখ্যা। দশ টাকা।

☐ সাহিত্যবাণী। আভাসচন্দ্র মজুমদার। ২৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা। ২৬/১, কৈপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়া-১ জীবনানন্দ স্মারক। তিরিশ টাকা।

☐ সম্মিলনী ঃ বেহালা। মীরা রায়। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বেহালা শাখা, ২, সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪, দশ টাকা।

☐ সাহিত্য সেতু। জগবন্ধু কুণ্ডু। ৩২ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা ১৬ জানুয়ারি ১৯৯৯ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

☐ কলকাতা দুহাজার। জ্যোতির্ময় দত্ত, ১৪/১০৭ গল্ফ ক্লাব রোড, কলি-৩৩, ১৫ টাকা।

☐ সাহিত্য যুগবিম্ব। সম্পাদকের নাম নেই। ১৪০, অমর পল্লী, কলকাতা-৭৪ চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। আশ্বিন ১৪০৫, মূল্য তিন টাকা।

☐ প্রবাসে নিজভাষে। মন্দিরা পাল। ১১ সি, গুলমার্গ, অনুশক্তিনগর, মুম্বাই-৪০০০৯৪, পনেরো টাকা।

☐ বিশ্বসারথী। ভবতারণ দাস। ১৯ মণি সান্যাল সরণি। কলিকাতা-২৭, দুই টাকা।

☐ উত্তরপক্ষ। সাহিত্য ত্রৈমাসিক ১৭ বর্ষ প্রথম সংখ্যা। রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ডি-৩৩ সারদা পার্ক, ঘোত শিবরামপুর, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ৭৪৩ ৩৫২, দুই টাকা।

☐ সাহিত্য দর্পণ—শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৫। তরুণ রায় চৌধুরী। ৩এ, রজনী ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬। ৪৫ টাকা।

পুস্তক ঃ

☐ সাদা ঘোড়ার স্রোত। শিমুল মাহমুদ। নিত্যপ্রকাশ, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, ষাট টাকা।

☐ আধুনিক মননে সাহিত্য ভাবনা ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানব গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, পঞ্চাশ টাকা।

☐ তাই আছি আপাতত। সৌভিক জানা। অভিষেক ৭৮ ডি, কাইজার স্ট্রীট, কলি-৯, দশ টাকা।

☐ পরম পরিমণ্ডল। পিয়ের তেয়ার দ্য শাঁদ্যা। অনুবাদ —স্বপন দাস মহাপাত্র, ম্যাথু শিলিংস এস. জে.। বাণীতীর্থ, ডটারস অফ সেণ্ট পল, ৩৫ রয়েড স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৬। ৩০ টাকা।

☐ মির্জা গালিব। সঞ্চারী দাশগুপ্ত। আসমান-জমিন, ২২৯ বিধান পল্লী, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪। ৮০ টাকা।

☐ এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি। ওমর আলী। ত্রয়ী প্রকাশন ৬৭, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০, ৪০ টাকা।

☐ এখন আমি আছি আর আমার থেমে যাবার আশঙ্কা। কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত। মুকাভিনয় প্রকাশনা ৩৮/৫৭ এ, মীনাপাড়া রোড, কলকাতা-৯২, ৪০ টাকা।

☐ শ্রীচৈতন্য ও ও বাংলার নবজাগরণ। প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নব ভারতীভবন, ৩১-এ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, ২৫ টাকা।

☐ আদিত্যকুমার স্মরণ মঙ্গল। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু। সধাক কবি আদিত্যকুমার স্মৃতি সমিতি, ১৩৫ হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬, আশি টাকা।

☐ আ-মরি আমার খামে গান। দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য কহন, ১৩/১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা-১৯ পনেরো টাকা।

☐ জ্যোৎস্নায় ভিজে। কামরুন নাহার হেনা। প্রতিভু, মতিঝিল ঢাকা-১০০০, ৪৫ টাকা।

☐ অরণ্য থেকে করণ্যে। নীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কোদালিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ৪০ টাকা।

☐ ক্যুইজ অন নজরুল। প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী। শশধর প্রকাশনী ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, বারো টাকা।

অনুরাগের নিবেদন

'অনুরাগ' বছরে তিনটি সংকলন প্রকাশ করে। বইমেলা, পঁচিশে বৈশাখ, শারদীয়। জানুয়ারি, মে, সেপ্টেম্বরে।

আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ ছোট লেখাটি অনুরাগের জন্যে পাঠাবেন। জেরক্স কপি চলবে না। কাগজের এক পিঠে লিখবেন।

প্রতি ইং মাসের তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যায় সাহিত্য সভা বসে। সম্পাদকের সঙ্গে যা কিছু আলোচনা, তখনই করতে হবে। অন্য সময় তাঁকে পাওয়া যাবে না।

তখন—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৩৫ হাজরা রোড. কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

অনুরাগের সদস্য হবার জন্য বছরে ১২০ টাকা শ্রীমতী ধীরা ভট্টাচার্যের নামে পাঠাবেন। ৬০ টাকা করে দু বারেও দিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন দিয়েও অনুরাগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন। তবেই অনুরাগের প্রকাশ নিশ্চিত হতে পারে।

ASSET INTERNATIONAL

Internationally Certified Courses
ISO 9001 Certified
Operating in 10 Countries World Wide
Over 1000 Centres Around The World

A. Q. A. D

- Oracle
- Developer 2000
- Power Builder
- Visual C++ wh MFC
- Visual J++
- Visual Basic
- Windows NT
- Personality Development Workshop
- SQA & SPM

A. Q. P. P

- Basic H/W Concepts
- Windows 95 & 98
- OOP Through C++
- Networking Technologics
- Windows NT Server+w/s
- Visual J++(Java)
- CGI Scripting+HTML
- Orcale 8, Developer 2000
- Internet
- Visual Basic+ActiveX

APTECH LIMITED

ASSET International

Certified Computer Course
A Division of Aptech Limited

CA-38 SECTOR-1. SALT LAKE CITY. Cal-700 064. P. 358 5949

Edited and Published by Sm. Dhira Bhattacharya M. A.,
from 34/2, Mahim Haldar Street, Calcutta-700 026